দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

৭৩ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা ।। ৩০ নভেম্বর ২০২০
১৪ অগ্রহায়ণ - ১৪২৭ ।। যুগাব্দ ৫১২২
website : www.eswastika.com

শাসকের মদতে পশ্চিমবঙ্গে গোরু পাচারের বাড়বাড়ন্ত

—পৃঃ ১০

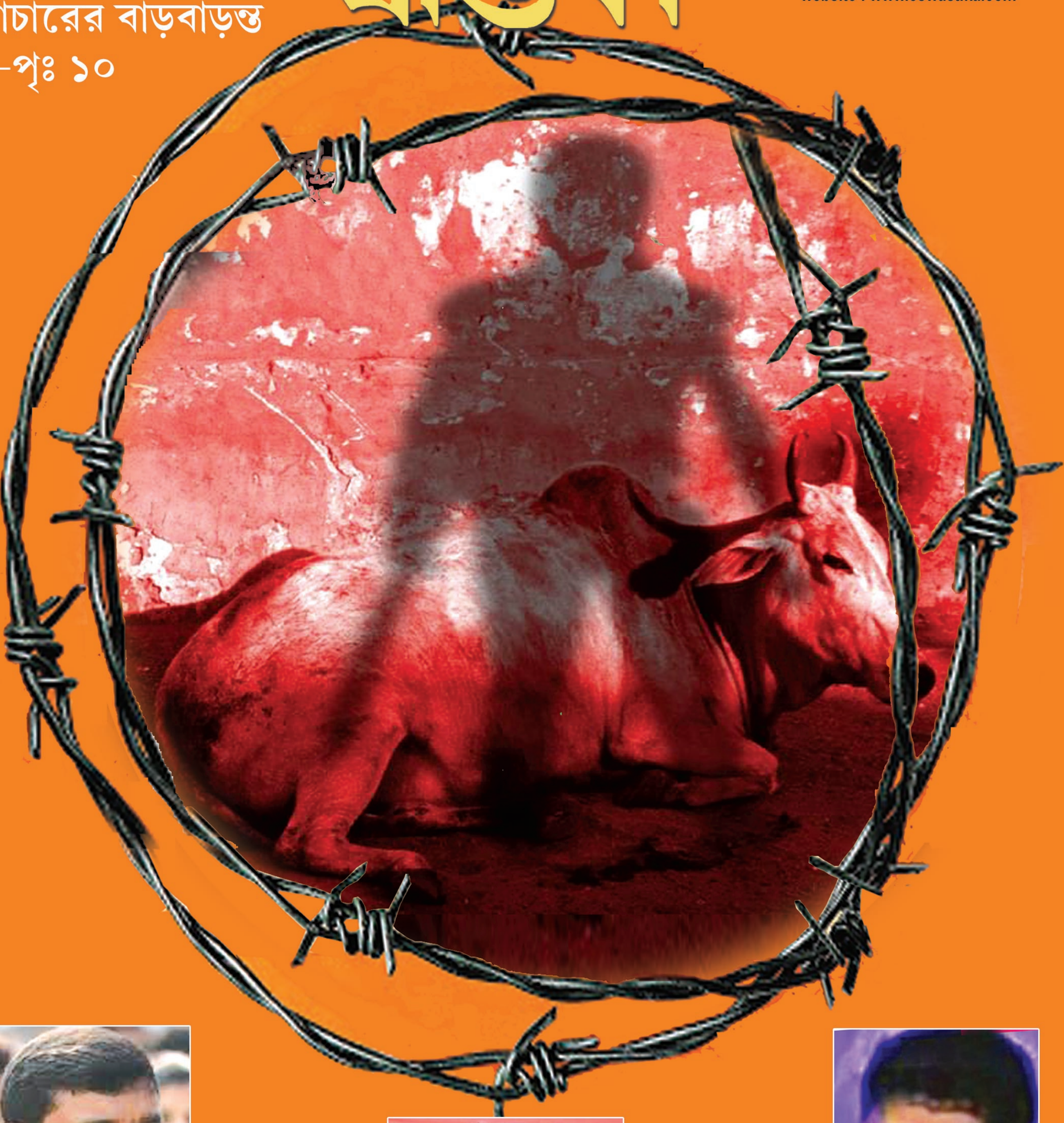

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ১৪ সংখ্যা, ১৪ অগ্রহায়ণ, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

৩০ নভেম্বর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,

Website : www.eswastika.com

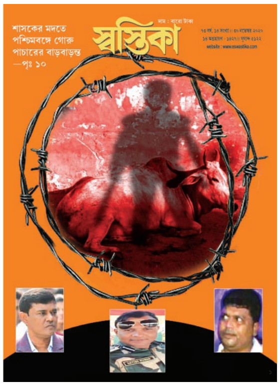

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৩

চীনের আগ্রাসন ও ভারতের প্রতিরোধ ক্ষমতার সমীক্ষা ▯ ডা: আর এন দাস ▯ ৪

আল কায়দা জঙ্গি, গোরু ও কয়লা মাফিয়া চক্রের শেকড় নবান্ন পর্যন্ত বিস্তৃত নয় তো? ▯ সাধন কুমাল পাল ▯ ৭

শাসকের মদতে পশ্চিমবঙ্গে গোরু পাচারের বাড়বাড়ন্ত ▯ তরুণ কুমার পণ্ডিত ▯ ১০

২৬ নভেম্বরের ভারত বন্ধ সুপার ফ্লপ-শো ▯ বিশ্বামিত্র ▯ ১২

২৬ নভেম্বর স্মরণ বাংলাদেশে : পাকিস্তানকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ঘোষণা দাবি ▯ ১৩

আত্মনির্ভর কৃষিব্যবস্থার পথে ভারত ▯ অনু বর্মণ ▯ ১৫

কৃষকদের স্বার্থেই মোদি সরকারের কৃষি বিল ▯ সোমনাথ গোস্বামী ▯ ১৬

দেশটা ভারতবর্ষ বলেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা পার পেয়ে যান ▯ রঞ্জন কুমার মণ্ডল ▯ ১৮

বচন রক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে জীবনে অনেক উন্নতি সম্ভব ▯ স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ ▯ ২২

করোনা অতিমারীকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করছে কেন্দ্র সরকার ▯ শ্রীমতী সুজাতা ▯ ২৪

ভণ্ডরা মাজার-মসজিদ ছেড়ে হিন্দুত্বের ভক্ত সাজছেন ▯ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▯ ২৬

আতঙ্কের প্রহরে মানুষের শুভবুদ্ধির বিকাশ ▯ বিশ্বজিৎ মণ্ডল ▯ ২৭

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ ▯ ইন্দুমতি কাটদরে ▯ ২৯

চিঠিপত্র ▯ ৩১

শঙ্কর শঙ্কর সম ▯ রামানুজ গোস্বামী ▯ ৩৩

মহীয়সী সীতা ▯ অশোক দাস ▯ ৩৬

শিশুকাল থেকেই শিশুদের দাঁতের যত্ন নিতে শেখাতে হবে ▯ ডা: শঙ্কর ব্যানার্জি ▯ ৩৯

পশ্চিমবঙ্গ বোমা তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে ▯ ৪০

বালকৃষ্ণ নাইক : এক নিষ্কাম দিব্যাত্মার জ্যোতিঃপুঞ্জে বিলয় ▯ বিনোদ বনসল ▯ ৪১

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

রক্ষক ভক্ষক হইলেই সর্বনাশ

দেশ ও দেশবাসী রক্ষার দায়িত্ব যাহাদের হাতে, তাহারাই যদি ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সর্বনাশের শেষ সীমায় পৌঁছাইয়াছে। মহামতি চাণক্য বলিয়াছেন, শাসক যদি দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে রাষ্ট্রভক্ত জনসাধারণের কর্তব্য সেই শাসককে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া নূতন শাসকের অভিষেক করিতে হইবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটির শাসক তথা রক্ষকরাই আজ ভক্ষকে পরিণত হইয়াছে। রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি আজ ঘুণপোকার মতো পশ্চিমবঙ্গকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছে। শাসকের প্রশ্রয়েই রাজ্যটি গোসম্পদ পাচারের কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠী তাহাদের জাল বিস্তার করিয়া রাজ্যটিকে বোমার কারখানায় পরিণত করিয়াছে।

সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে, গোরুপাচার চক্রের কারবারিদের ওপর রাজ্যের শাসকদলের বরদহস্ত রহিয়াছে। রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় বিশেষ করিয়া উত্তরবঙ্গ জুড়িয়া চোরাচালানকারীদের দ্বারাই সীমান্তের গ্রামবাসীদের জীবন দুর্বিসহ হইয়া উঠিয়াছে। সীমান্তে গোরুপাচার চক্রের পাণ্ডা মুর্শিদাবাদের এনামুল হকের সঙ্গে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর আধিকারিকদের যোগসাজসের চিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। এনামুল হককে সিবিআই গ্রেপ্তার করিয়াছে। বিএসএফ কর্তা সতীশকুমারের সূত্র ধরিয়াই এনামুলকে গ্রেপ্তার করিয়াছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এনামুল,আনারুলদের হইতে মোটা অঙ্কের বখরা লইতেন সতীশকুমার। তাহাকেও সিবিআই গ্রেপ্তার করিয়াছে। অতীব দুঃখের বিষয়, শুধু সীমান্তরক্ষার বাহিনীর আধিকারিক সতীশকুমারই নন, এই পাচারচক্রের সহিত জড়িত বিএসএফের ৭ জন এবং শুল্কদপ্তরের ৫ জন আধিকারিককে গ্রেপ্তার করিয়াছে সিবিআই। সিবিআই আধিকারিকদের সন্দেহ, গোরুপাচার চক্রের বিপুল অর্থ বিভিন্ন জঙ্গি তহবিলেও যাইতেছে। ইহার জন্য দেশজুড়ে তল্লাশি অভিযান শুরু করিয়াছে সিবিআই। আলকায়দা জঙ্গি যোগে এরাজ্যে ছয়জনের গ্রেপ্তারে যখন রাজনৈতিক মহল তোলপাড় চলিতেছিল, তখনই গোরুপাচার চক্রের চাঁইদেরও নাম উঠিয়া আসে কেন্দ্রীয় তদন্ত আধিকারিকদের হাতে। জঙ্গি যোগে গ্রেপ্তারের পরই রাজ্যের শাসকদলের মন্ত্রী ইহার বিরোধিতায় মুখর হইয়াছিলেন। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীও প্রশ্ন তুলিয়াছিলেন যে, রাজ্যকে না জানাইয়া কেন গ্রেপ্তার করা হইয়াছে? গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, গোরুপাচার চক্রের টাকাই পৌঁছাইয়া যাইতেছে বিভিন্ন জঙ্গিদের হাতে। আর ইহাতেই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই টাকয় শাসরদলেরও ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে।

সীমান্ত এলাকার মানুষ মনে করেন, গোরুপাচারের বিপুল টাকা রাজ্যের শাসকদলের নির্বাচনী তহবিলেই যাইতেছে। শাসকদলের নেতাদের পারাচারকারীদের মদতদানের কথা সীমান্ত এলাকার মানুষের মুখে মুখে শোনা যাইতেছে। কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী সত্যিই বলিয়াছেন, 'গোরুপাচারের জন্য তৃণমূল নেতাদের কত টাকা মাসোহারা দিতে হইত তাহা পুলিশ তো জানেই, সীমান্ত এলাকার সাধারণ মানুষ আরও ভালো করিয়া জানেন। কলকাতা পুলিশের হেডকোয়ার্টার হইতে দিদির দলের জন্য টাকার পাহাড় তৈরি করিতে গোরুপাচারে তাহারা মদত দিতেছে।'

বস্তুত রক্ষকের ভক্ষক হইয়া উঠিবার ক্রম বাম আমলেই শুরু হইয়াছে। তাহাদের মদতে সীমান্ত এলাকা হইয়া উঠিয়াছিল চোরাচালান কারবারিদের স্বর্গরাজ্য। তাহাদের রক্তচক্ষুর ভয়ে গ্রামবাসীর প্রতিবাদ করিবার সাহস ছিল না। দীর্ঘ চৌত্রিশ বৎসরে রাজ্যটিকে তাহারা প্রায় শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল। মানুষ তাহাদের হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য শাসক বদল করিয়াছিল। কিন্তু হা হতোস্মি! বর্তমান শাসক রাজ্যটিকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিয়াছে। তাই সময় আসিয়াছে কৌটিল্যের উপদেশকে বাস্তবে পরিণত কবিবার। আগামী একুশের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গকে পুনরুজ্জীবিত করিতেই হইবে।

সুভাষিতম্

উপকারাচ্চ লোকানাং নিমিত্তান্মৃগপক্ষিণাম্।
ভয়াল্লোভাশ্চ মূর্খানাং মৈত্রী স্যাদ্দর্শনাৎসতাম্।।

সাধারণ মানুষের মিত্রতা একে অপরের উপকার করলে হয়ে থাকে। পশু-পক্ষীর মিত্রতা কোনো কারণবিশেষে হয়ে থাকে। মূর্খদের মিত্রতা ভয় ও লোভ থেকে হয়ে থাকে এবং সাধুদের মিত্রতা পরস্পর দর্শনমাত্রই হয়ে থাকে।

চীনের আগ্রাসন ও ভারতের প্রতিরোধ ক্ষমতার সমীক্ষা

ডাঃ আর এন দাস

ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিরক্ষা বিষয়ক স্ট্যাটেজিস্ট কৃষ্ণস্বামী সুব্রহ্মণ্যম বর্তমান বিদেশমন্ত্রী ড. জয়শংকরের বাবা, ইন্সটিটিউট অব ডিফেন্স স্টাডিজ অ্যান্ড অ্যানালিসিসের অধিকর্তা, কারগিল রিভিউ ও জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটির প্রধান। তাঁর কথায়, 'ভারতের সঙ্গে চীনের মতাদর্শের লড়াই চলছে। কমিউনিজম বনাম গণতন্ত্র। দমননীতির দ্বারা চীনের উত্থান। ভারতে মোদীজী গণতন্ত্রের মাধ্যমেই স্বল্প সময়ে বিকাশ করে সারাবিশ্বে আলোড়নের ঝড় তুলেছেন। অসামান্য সাফল্যে অসংখ্য বাধাবিপত্তি ও প্রতিকূলতার মাঝে প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ, জল এবং রান্নার গ্যাস পৌঁছে দিয়েছেন। অবিশ্বাস্য গতিতে, সামরিক শক্তি, আর্থিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করেছেন। সৌরশক্তি এবং আন্তরীক্ষ শক্তির পরাকাষ্ঠা ভারতকে আজ বিশ্বের চতুর্থ শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। চীন ও ভারতের চীনপ্রেমীদের বিদ্বেষের কারণ এটাই।' যোগঋষি রামদেবের কথায়, ভারতকে স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনতে হলে সর্বপ্রথমে, সামরিক, বৈজ্ঞানিক, আর্থিক ও আত্মিক বলে বলীয়ান এক আত্মনির্ভর ভারত গড়তে হবে। শিবসেনা, আকালি, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, আরজেডি এবং বিজেডি নামের বংশবাদগ্রস্ত প্রাদেশিক স্বার্থান্বেষী নীতিহীন রাজনৈতিক দলগুলি তোতাপাখির মতো বলে চলেছে— 'চীনের উত্থান নাকি অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পথে হয়েছে। চীন ভারতের মতো প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামেনি, চীন মুখে ও কাজে এক, সারাবিশ্বে পিএলএ অপরাজেয়। চীন-পাকিস্তান একত্রে ভারতকে কখনই আক্রমণ করবে না এবং শীর্ষনেতাদের মধ্যে বার্তালাপের মাধ্যমেই শান্তিপ্রিয় চীন সীমান্ত-বিবাদ মিটিয়ে ফেলবে।' ভারতবিরোধী চীনপন্থীদের কথায় করোনা মহামারীর বাণিজ্য ঘাটতি নাকি চীনকে আমেরিকার স্থানে পৌঁছাতে উৎসাহ জোগাচ্ছে।

বিহারে তেজস্বী যাদবের উত্থান, দিশা সালিয়ান ও সুশান্ত রাজপুতের অস্বাভাবিক মৃত্যু, উদ্ধব ঠাকরে ও যোগী আদিত্যনাথের বাকযুদ্ধ এবং রিপাবলিক চ্যানেলের কর্ণধার অর্ণব গোস্বামীর বেআইনি গ্রেপ্তার ও শারীরিক নির্যাতন দেশপ্রেমী মানুষের মনে হতাশা এনে দিয়েছে সত্যি। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিশ্বনিয়ন্তার পরিকল্পনাকে রদ করার ক্ষমতা কারুর নেই। গালওয়ানে ২০ জন ভারতীয় সেনার আত্মত্যাগও কখনও ব্যর্থ হবে না। ভারত জাগছে।

চীন ভালোই বুজেছে যে, ১৯৬২ সালের নেহরুর ও ২০২০ সালের নরেন্দ্র মোদীর ভারত এক নয়। ডোকলামে (২০১৭) হারের পর এবং ২০১৯-এ বিজেপির উত্থানে দেশের রাজানতিক বিরোধীরা ভীষণভাবে চিন্তিত। পূর্বলাদাখের অধিকৃত অঞ্চলগুলি চীন ছাড়বে না। চীন উস্কাচ্ছে যাতে ভারত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধে ভারতের সঙ্গে চীনেরও বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যাবে। অবশ্য স্বৈরাচারী কমিউনিস্ট চীন দমননীতির সাহায্যে যে বিকাশ করতে পারবে, গণতন্ত্রের ছত্রছায়ায় ভারতের পক্ষে সেটা করা হবে কঠিন। ভারতকে তাই সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে। চীনের সীমান্ত-বিবাদ ১৮টি প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে আছে। করোনা মহামারী চীনের উহান থেকে ছড়িয়ে পড়ায় সারাবিশ্ব আজ চীনকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। অস্ট্রেলিয়া, জাপান, আমেরিকা ও ইউরোপের কোম্পানিগুলি চীন ত্যাগ করে ভারতেই নিবেশের জন্য চেষ্টা চালাচ্ছে।

লাদাখে চীনের আগ্রাসন ঈশপের রূপকাথার নেকড়ে ও মেষশাবকের কাহিনির মতো। তাইওয়ান, তিব্বত হংকং ও সিঞ্জুয়ানকে গ্রাস করে চীন এখন পাকিস্তানের মতো ভারতকেও তার পোষ্য সামন্ত-দেশে পরিণত করতে চায়। মোদীজীর ভারত সাম্রাজ্যবাদী চীনের বিস্তারবাদ সহ্য করবে কেন? লাদাখের পর অরুণাচলের তাওয়াংকেও চীন এখন নিজের বলছে। সাত দশক ধরে ভারতের বিকাশ ও অগ্রগতিকে

দমিয়ে রাখার জন্য পাকিস্তান এবং আমেরিকাকে দমিয়ে রাখার জন্য চীন উত্তর কোরিয়া ও ইরানকে ব্যবহার করে এসেছে সংযুক্ত রাষ্ট্রপুঞ্জে ভেটো ক্ষমতার সাহায্যে।

বিস্তারবাদী চীন জড় বুদ্ধিসম্পন্ন তথাকথিত 'বুদ্ধিবেচিদে'র সহযোগিতায় প্রতিবেশী দেশগুলিকে ক্রীতদাসে পরিণত করতে চায়। ভারতের চীনা দালালরা বলছে, ভারতের উচিত বিআরআই প্রজেক্টে চীনকে সাহায্য করা। ভারতের বৈদেশিক নীতিতেও চীনের প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে। দেশীয় জয়চাঁদরা চায় না আমেরিকা ভারতের সঙ্গে চুক্তি করুক। রাহুল গান্ধীকে চীনা দূতাবাসে ষড়যন্ত্রে শামিল হতে দেখা গেছে। কংগ্রেসের মণিশংকর আইয়ার ও শশী থারুর সোজা পাকিস্তানের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখেন।

আজ নতুন ভারতের সফট পাওয়ার, স্বামী রামদেবের আয়ুর্বেদ এবং পতঞ্জলির যোগ সারাবিশ্বে ১৯৩টি দেশকে ২১ জুন সম্মিলিত করতে পেরেছে। ইস্কনের সন্ন্যাসীরা সমস্ত ইউরোপ, আমেরিকা, রাশিয়া পর এখন মুসলমান দেশগুলিতেও প্রবেশ করছে। তাতে চীন ও পাকিস্তানপন্থীদের হয়েছে ভীষণ গোঁসা। তাদের দাবি ভারতকে বিরত থাকতে হবে এভাবে সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য বিস্তার থেকে। অল্প সময়ের জন্য হলেও একবার ভারতকে আইএমএফের প্রধান বিশ্বের দ্রুততম আর্থিক বিকাশের তকমা দিয়ে সম্মানিত করলে চীনের আঁতে ভীষণ ঘা লাগে। এই সম্মান পাওয়া হচ্ছে চীনের জন্মসিদ্ধ অধিকার। চীনপন্থীরা তা কীভাবে সহ্য করবে যখন ভারত অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তা দখল করে নিচ্ছে?

মোদীর ভারতে গুজরাটে তৈরি পৃথিবীর সর্বোচ্চ ১৬৩ফিট উঁচু স্ট্যাচু অব ইউনিটির প্রতীক সর্দার প্যাটেলের মূর্তিটিতেও চীনের ভীষণ আপত্তি। চীনের কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র গ্লোবাল টাইমসে এই বিষয়ে উষ্মা প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ বিশ্বের সবকিছুর রেকর্ড গড়ার অধিকার শুধু চীনেরই থাকবে। ভারত কেন নাক গলাবে? ভারতকে সর্বদা দাবিদাওয়া ও বিবাদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বিকাশ ও উন্নতিতে বাধা উৎপন্ন করছে চীন। মস্কোতে পাঁচ দফা চুক্তি হওয়ার পরেও চীন বলতে শুরু করল— ভারত লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ঘোষণা করতে পারবে না ও ১৯৫৯ সালের নিয়ন্ত্রণ রেখাকেই চীন মানবে। আরও উদাহরণ আছে। রাশিয়ার ব্লাডিভোস্টকের মতো গত ২-৩ জুনে আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিষয়ক অধিবেশনে চীন ভুটানের সাকটেং নামক অভয়ারণ্যটিকেও এখন নিজের বলে দাবি করেছে।

আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তোলার পথে চীন ও পাকিস্তান নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। দক্ষিণ চীনসাগর অরক্ষিত রেখে ভারত যাতে তার বিশাল সৈন্যসম্ভার ও সামরিক শক্তিকে পাকিস্তান এবং চীনের সীমান্তে ব্যস্ত রাখে, তাহলে ভারতের বিকাশ ও উন্নতি অবরুদ্ধ হবে।

চীনের দাবি পাকিস্তানের প্রতি ভারতের মনোভাবের পরিবর্তন করতে হবে। ইসলামিক জিহাদকে তাদের ধর্মের অভিন্ন অঙ্গ বলেই স্বীকার করে নিতে হবে ভারতকে। দক্ষিণ চীনসাগর অরক্ষিত রেখে ভারত যাতে তার বিশাল সৈন্যসম্ভার ও সামরিক শক্তিকে পাকিস্তান এবং চীনের সীমান্তে ব্যস্ত রাখে, তাহলে ভারতের বিকাশ ও উন্নতি অবরুদ্ধ হবে। সেটারই নিরন্তর প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে দেশ দুটি।

একদিকে লাদাখ, কারাকোরাম ও গিলগিট, বালটিস্তান, অন্যদিকে বালুচিস্তান—যেনতেন প্রকারেণ দখল করাই হচ্ছে চীনের অভিপ্রায়। তিব্বতের কৈলাশ মানস সরোবর দখল করে নিয়েছে। কারণ সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র দুটি বিশাল নদীর উৎস ওই সরোবর। সেখানে এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘা ছাড়া আরও ৮টি বরফাচ্ছাদিত পর্বত আছে। জলশক্তি সম্পদের বিচারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বাইফো, বালুটুরা ও বালটোর নামক তিনটি বিশাল হিমবাহ আছে ঠিক এখানেই, যেখান থেকে প্রবাহিত নদীর গতিপথ রুদ্ধ বা পরিবর্তিত করে এবং বাঁধ নির্মাণ করে উত্তরপূর্ব ভারতের বেশিরভাগ অংশকে মরুভূমিতে পরিণত করতে পারে চীন।

অন্যদিকে বালুচিস্তানের 'রেয়ার আর্থ' ছাড়াও রয়েছে কয়লা, লোহা, তামা, সোনার অসীম ভাণ্ডার। চীন সেটাকেও দখল করার তালে রয়েছে। ভুটানকে চীনের সঙ্গে দূতাবাসযুক্ত হয়ে বাধ্যতামূলক ভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করবে যাতে ভারতের শিলিগুড়ি করিডোর 'চিকেন নেকের' ওপর চীনের পূর্ণ অধিকার স্থাপিত হয়। একবার দখল করতে পারলে ভারত থেকে উত্তরপূর্ব অঞ্চলটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে অনায়াসে। জম্মু-কাশ্মীরের আখনুর সেকটারটিকেও সন্ত্রাসবাদী হামলায় দখল করতে চাইছে পাকিস্তান এভাবেই।

বিহারের নালন্দায় হিউ-এন সাঙের স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপনেও গ্লোবাল টাইমসের আপত্তি। চীনের মনে ভয়, এখনই ভারতকে আটকাতে না পারলে ভারতের যে হারে বিকাশ ও অগ্রগতি হচ্ছে তাতে অচিরেই ভারত চীনকে অতিক্রম করে যাবে। ভারতের ২০৪৭ সালে উন্নততম দেশ গড়ার লক্ষ্য আর চীনের লক্ষ্য ২০৩৫ সালের মধ্যেই আমেরিকার উপর আধিপত্য স্থাপন করা। করোনা মহামারীর সুযোগে চীন লাদাখে যে ছায়াযুদ্ধ চালাচ্ছে তার পিছনে আছে বিরাট ষড়যন্ত্র। ভারতে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, রাজস্ব-ঘাটতি, আর্থিক মন্দা এবং বিকাশ দরের অধঃপতন প্রকট, তাই এই সময়টাকেই বেছে নিয়েছে ভারতকে নাস্তানাবুদ করার জন্য শি জিন পিং। তারা অরুণচলের তাওয়াং ও কাশ্মীরের লাদাখের উপর বেশি জোর দিচ্ছে। কারণ ওই অঞ্চলগুলি পুরাকালে নাকি তিব্বতের অভিন্ন অংশ ছিল। বর্তমান দলাই লামার

তিরোধানেই হবে সনাতনী তিব্বতীয় বৌদ্ধযুগের অবসান। সারাবিশ্বের বৌদ্ধদের সমর্থন পেতে হলে দলাই লামাকে ভারতরত্ন উপাধি দিয়ে সম্মানিত করার প্রয়োজন। সাত দশক ধরে অনুগামী চৈনিক বৌদ্ধদের তৈরি করেছে যেমনটি তারা, এখন করছে উইঘুর মুসলমানদের নিয়ে। তিব্বত ও ঝিন ঝিয়াঙের পরীক্ষাগারে চীনের কমিউনিস্ট বিজ্ঞানীরা জেনেটিক, সাইকোলজিক্যাল ও ধর্মীয় মতবাদের সংমিশ্রণে নতুন প্রজন্মের চীনা তৈরি করছে।

চীন ২,২২,২৩৬ বর্গকিলোমিটার আয়তনের সমগ্র কাশ্মীরের মধ্যে মাত্র ১১ শতাংশের ২৬,২৭৩ বর্গকিলোমিটার জম্মুকে ভারতের হাতে তুলে দিতে চায়। চীন তিব্বত ও পাকিস্তানকে স্থলপথে যুক্ত করে বালুচিস্তানের গোয়াদর বন্দরের সাহায্যে জলপথে মধ্য-এশিয়া ও ইউরোপের বাজার অধিকার করবে। এসবের থেকে বড়ো বাধা ভারত। তাই ভারতকে বাইরে ও ভিতর থেকে দুর্বল করতে হবে। দিশাহীন রাজনৈতিক বিরোধীরা তৈরি আছে। প্রতিবেশী ক্ষুদ্র বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ, মায়নমার ও শ্রীলঙ্কাকে ভারত বিরোধী করে তুললেই কেল্লা ফতে। এতদিন ঠিকই ছিল কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদী এসেই বাধ সেধেছে চীনের এই বিশ্বজয়ের স্বপ্নে।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই তিব্বত, কৈলাশ ও মানস সরোবর ছিল ভারতের অপরিহার্য অংশ। আজও সনাতন সভ্যতার সঙ্গে কৈলাশ যুক্ত বলেই প্রতি বছর চীন সরকার ভারতীয় তীর্থযাত্রীদের কাছ থেকে কর উশুল করছে। সেজন্যই তিব্বত হচ্ছে পিএলএ-এর সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যের সংঘর্ষের মূল কেন্দ্রবিন্দু।

চীনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আত্মনির্ভর ও নতুন ভারত জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছে। তবে ভারতকে তার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ও নীতি বদলাতে হবে। অজিত দোভালের কথায় 'অফেন্সিভ ডিফেন্স' ও স্বর্গত মনোহর পর্রিকরের কথায়— 'নো-ফার্স্ট'-নীতির আমূল পরিবর্তন করতে হবে। চীনের সঙ্গে যুদ্ধে সহযোগিতা ও প্রতিযোগিতা দুটি পদ্ধতিরই প্রয়োগ করতে হবে। আত্মনির্ভর নবভারত গড়ার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রে ও রাজ্যের নীতিতে প্রয়োজনীয় অনেক সংস্কারসাধন করতে হবে।

মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতে ভারতে তৈরি অস্ত্রের রপ্তানি আরও বাড়াতে হবে। ভারতের বিশাল সীমানাকে সুরক্ষিত করতে হবে আধুনিক প্রযুক্তিতে। একই সঙ্গে চীনের সঙ্গে বার্তালাপ চালানো ও সামরিক শক্তিতে ভারতকে আত্মনির্ভর হতে হবে। চীনকে কখনই বিশ্বাস করা চলবে না এমনকী শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরও। নরসিংহরাও ১৯৯৩ সালে বেজিং ভ্রমণে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ রেখার যে সন্ধিচুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, আজ চীন তা অস্বীকার করছে। ভারতের উচিত দুই যুযুধান বিশ্বশক্তির মেলবন্ধন করানো যেমনটি হওয়া উচিত ইজরায়েল ও ইরানের মধ্যেও। রাশিয়া ও ইরানের উপর থেকে চীনের প্রভাব কমাতে পারলেই অনেক সমস্যার সমাধান হবে।

ভারতের উচিত প্রতিরক্ষা উৎপাদনে জনগণের সাহায্য নেওয়া। ১৯৬১ সালের আয়কর আইনের ৮০জি-র অন্তর্ভুক্ত, কিষান বিকাশপত্রের মতোই দেশীয় ও অনাবাসী ভারতীয়দের কাছ থেকে 'ভারত সুরক্ষাপত্রে' বিনিয়োগের দ্বারা ভারতকে অনতিবিলম্বে বিশ্বের অন্যতম সামরিক শক্তিতে পরিণত করা যায়। নেতাজীর আহ্বানে, ১৯৪৫ সালে দেশের জন্য ভারতের মাতৃশক্তি গলার 'মঙ্গলসূত্রটি' দিতেও কুণ্ঠিত হননি।

হিন্দু, শিখ ও জৈন তীর্থযাত্রীদের জন্য লাদাখের মধ্যে দিয়ে কৈলাশ মানস সরোবর যাবার পূর্ণ অধিকার চীনের কাছ থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে। স্মরণাতীতকাল থেকেই মানস সরোবর ভারতের সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। রাষ্ট্রদূত ফুনচোক স্টোবদানের কথায়, ১৬৮৪ সালের 'তেমিস-গাং' চুক্তি অনুসারে, লাদাখ ও তিব্বতের সীমানায় অবস্থিত ওই ৩৮,০০০ বর্গকিলোমিটার অঞ্চল চীন ভারতকে দিতে বাধ্য। চীন হিমাচলের শতদ্রু ও অসমের ব্রহ্মপুত্র নদীর জলও নিজের অধিকারে রাখতে চাইছে। তাই সিয়াচীন গ্লেসিয়ার পর্যন্ত ভারতের সৈন্যশক্তিকে সর্বদা সজাগ রাখতে হবে। কারাকোরামের উপর দিয়ে প্রস্তাবিত চীন-পাকিস্তানের সড়ক যোজনাকে ব্যর্থ করতেই হবে।

বিআরআই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত সমস্ত দেশকেই চীন তার ঋণের ফাঁদে ফেলছে। তাই সংশ্লিষ্ট দেশগুলিকে সজাগ করা ভারতেরই কর্তব্য। সবশেষে বলা যায়, সাম্প্রতিক বৈঠকে কোয়াডের অন্তর্গত জাপান, অস্ট্রেলিয়া ও আমেরিকার সাহায্যে ভারত একদিন পিএলএ-কে পরাস্ত করতে পারলেই স্বাধীনতাকামী তিব্বতের মুক্তি সম্ভব হবে। □

বিশেষ আবেদন

বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বস্তিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। www.eswastika.com এতে ইন্টারনেট সংস্করণ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার সকল প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশেষ আবেদন, আপনারা স্বস্তিকার ইন্টারনেট সংস্করণটি আপনার পরিচিতদের মধ্যে হোয়াটস্অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তিকার প্রচারে আমাদের সহযোগিতা করুন।

—*ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা*

আলকায়দা জঙ্গি, গোরু ও কয়লা মাফিয়া চক্রের শেকড় নবান্ন পর্যন্ত বিস্তৃত নয় তো?

সাধন কুমার পাল

গত ১৯ সেপ্টেম্বর শনিবার সকালে মুর্শিদাবদের ডোমকল থেকে ছয় আলকায়দা জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করে এনআইএ। কেরল থেকে মুর্শিদাবাদেরই আরও তিন জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়। প্রাথমিক তদন্তের পর এনআইএ জনিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে এই ৯ জঙ্গিকে ট্রেনিং দিত পাকিস্তানে থাকা আলকায়দার মাথারা। ভারতে বড়ো নাশকতার ছক কষছিল তারা। এনআইএ-র তৎপরতায় দেশবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেও আলকায়দা জঙ্গি সন্দেহে ধৃতদের 'নিরপরাধ' বলে দাবি করলেন রাজ্যের গ্রন্থাগারমন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী। আলকায়দা প্রসঙ্গে সিদ্দিকুল্লার বক্তব্য, মসজিদের ইমাম, স্থানীয় পঞ্চায়েত ও কাউন্সিলরের থেকে তিনি জেনেছেন, ধৃতদের অধিকাংশই 'ছা-পোষা'। তাঁর কথায় 'ডোমকলে যা ঘটেছে, তাতে দু'-একজন জাকির নায়েকের বই পড়েছে। বই পড়ে একটা মানসিকতা তৈরি হয়েছে। তা বলে তাদের উপর শাস্তি বর্তায় না।' খাগড়াগড় কাণ্ডেও মাদ্রাসা ব মসজিদ জড়িত ছিল না দাবি করে মন্ত্রী বলেন, 'মসজিদ, মাদ্রাসা, ইমামদের নাম করে মুসলমান সমাজের সঙ্গে সঙ্ঘাত তৈরি করতে চায় দিল্লি। কেন্দ্রীয় সংস্থার গোয়েন্দরা আরবি পড়তে জানেন না বলেই নিরপরাধ মানুষকে জঙ্গি বানাচ্ছেন।' গোরুপাচার নিয়ে সিদ্দিকুল্লার বক্তব্য, 'সীমান্তে যাঁরা আছেন, সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ — মূল অপরাধী তাঁরা। গোরুপাচার যারা করছে তারা অনেক নীচে। বিএসএফ তুমি সরকারের উর্দি পরেছ, তোমাদের হাতে রাইফেল। গদ্দারি করলে বিএসএফ করেছে।'

সংবিধানের নামে শপথ নিয়ে মন্ত্রিত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ সরকারি পদে থেকে একদিকে জঙ্গি সন্দেহে ধৃতদের নিরপরাধ বলা, অন্যদিকে দেশের সীমান্ত নিরাপত্তার

দায়িত্বে থাকা রক্ষীবাহিনীকে গদ্দার বলে প্রকাশ্য বিবৃতি দেওয়ার পরেও বহাল তবিয়তে চেয়ারে থাকার অর্থ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার সম্পূর্ণ ভাবে এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। কারণ তৃণমূল কংগ্রেস বা রাজ্য সরকারের তরফে এটা বলা হয়নি যে সিদ্দিকুল্লার এই বক্তব্য তার ব্যক্তিগত, সরকারের নয়।

সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ, গোরুপাচার, জালনোটের কারবার, মাদ্রাসার জাল বিস্তার --- এগুলি সবই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত। ফলে এনআইএ-র হাতে জলঙ্গি থেকে এক গুচ্ছ জঙ্গি গ্রেপ্তার হওয়ার পরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারি অব্যাহত রাখছিল কেন্দ্রের একাধিক তদন্তকারী দল। এই সেপ্টেম্বরেই কেরলের বাসিন্দা বিএসএফ কমান্ডান্ট জিবু ডি ম্যাথিউয়ের আয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন অর্থের উৎস খুঁজতে গিয়েই পশ্চিমবঙ্গে গোরুপাচার চক্রের হদিশ পায় সিবিআই। তাতেই বিএসএফ, কাস্টমস-সহ বিভিন্ন দপ্তরের একাধিক সরকারি আধিকারিকের নাম উঠে আসে। গোয়েন্দারা জানতে পারেন মুর্শিদাবাদের ডাকসাইটে ব্যবসায়ী এনামুল হক ও তাঁর সিন্ডিকেট চক্রকে গোরুপাচার সহায়তা করতেন তাঁরা। বিষয়টি নিয়ে বিশদে তদন্ত শুরু হলে অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে এফআইআর-এ সতীশ কুমারের নাম উঠে আসে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১৫-র ডিসেম্বর থেকে ২০২৭-র এপ্রিল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে বিএসএফের ৩৬ নম্বর ব্যাটলিয়নের কমান্ডান্ট ছিলেন সতীশ কুমার। ওই ১৬ মাসে তাঁর বাহিনী মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে প্রায় ২০ হাজার গোরু বাজেয়াপ্ত করেছিল। কিন্তু সেই বাজেয়াপ্ত গোরু সরকারি খাতায় বাছুর হিসেবে দেখানো হচ্ছিল। গোরুর যা দাম, তার চেয়ে কম দামে সেগুলি স্থানীয় বাজারে নিলাম করা হতো। সেখান থেকে বাছুরের দামে গোরু কিনে নিত পাচারকারীরা। এই পাচারচক্রের মাথায় ছিলেন এনামূল হক। তাঁর তত্ত্বাবধানে নিলামে কেনা ওই গোরু আবার বাংলাদেশে পাচার হয়ে যেত। গোরুকে বাছুর বানিয়ে

এনামুল হক

অনুপ মাঝি (লালা)

সতীশ কুমার

দেওয়া বিএসএফ এবং কাস্টমস আধিকারিকদের সঙ্গে সংযোগ ছিল তাঁর। মোটা টাকা দিয়ে তাঁদের পুষিয়ে দিতেন তিনি। এমনটাই অভিযোগ।

গত ২৩ সেপ্টেম্বর সতীশকুমারের সল্টলেকের বাড়িতে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। সেই সময় রায়পুরে কর্মরত ছিলেন সতীশকুমার। সেখানেও তল্লাশি চালানো হয় একদফা। তাঁর গাজিয়াবাদের বাড়িতেও তল্লাশি চলে। তাতে আয়ের সঙ্গে বিপুল পরিমাণ সঙ্গতিহীন সম্পত্তির হদিশ পান কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা। জানা যায়, অনেক আত্মীয়ের নামেও স্থাবর সম্পত্তি কিনে রেখেছেন তিনি। ঘুষের টাকা বিভিন্ন সংস্থায় বিনিয়োগ করেছেন। যদিও সেই সময় এনামুলের নাগাল পাওয়া যায়নি। সিবিআই সূত্রে প্রাথমিক ভাবে জনা গিয়েছে, গোরুপাচার করে যে বিপুল পরিমাণ টাকা এনামুল হক আয় করে তা বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের জন্য বিনিয়োগ করত। গোরুপাচার করতে গিয়ে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একাধিক কর্তার সঙ্গে এনামুল হকের গোপন আঁতাত তৈরি হয়। সেইসব কর্তাদেরও খুঁজে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সিবিআই।

রিপোর্ট বলছে, বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ গোরুপাচারের অপরাধে ২০১৮ সালের মার্চ মাসে সিবিআই গ্রেপ্তার করে এনামুল হক-কে। সপ্তাহ তিনেক সিবিআইয়ের হেপাজতে থাকার পর জামিনে মুক্ত হয় ওই পাচারকারী। একইদিনে কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গোরুপাচার চক্রের পাণ্ডাদের খোঁজে তল্লাশি চালান সিবিআই-এর গোয়েন্দারা। এর মধ্যে বিধাননগরে এক বিএসএফ কর্তার বাড়ি সিল করে দিয়েছে সিবিআই। উদ্ধার হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি। তদন্তকারীদের অনুমান, বাংলাদেশে গোরুপাচারের টাকার একটা বড়ো অংশ যায় জঙ্গিদের হাতে।

৬ নভেম্বর ভোরে দিল্লি থেকে এনামুল হক-কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে কলকাতায় আনা হয়েছে বলে সিবিআই সূত্রে খবর। অমিত শা'র রাজ্য সফর চলাকালীন কলকাতা ও আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বিভিন্ন জায়গায় একযোগে চালায় দুই কেন্দ্রীয় সংস্থা— সিবিআই ও আয়কর দপ্তর। গোরুপাচরে অভিযুক্ত প্রাক্তন বিএসএফ কর্তা সতীশকুমারের সল্টলেকের বাড়িতেও চলে অভিযান। এছাড়া সিআরপিএফ-কে সঙ্গে নিয়ে আসানসোলের বিভিন্ন জায়গায় কয়লা ব্যবসায়ীদের বাড়ি ও অফিসে হানা দেন আয়কর দপ্তরের কর্তারা। সূত্রের খবর,

গোরুপাচারকারী এনামুলের দলের সঙ্গে কুখ্যাত কয়লা মাফিয়া 'লালা' ওরফে অনুপ মাজির যোগাযোগ পেয়েছে সিবিআই। এ নিয়ে ইডি-র তদন্ত চললেও সমান্তরাল তদন্ত চালানোর কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। এর জন্য সারদা কাণ্ডের তদন্তে যুক্ত আধিকারিকদের দিল্লিতে তলব করেছে সিবিআই। জানা গিয়েছে, কয়লাকাণ্ডে আয়কর দপ্তরের কাছ থেকে তদন্তের ভার নিতে চায় সিবিআই।

সম্প্রতি, আয়কর দপ্তর কয়লাকাণ্ডে যুক্ত অনুপ মাজি ওরফে লালা ও বেশ কিছু ব্যবসায়ীর কলকাতা, আসানসেলের বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালিয়ে বেশ কিছু নথি পেয়েছে। নথির ভিত্তিতে তারা জেনেছে, রাজ্যের ভিতর গোরুপাচারে যুক্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কয়লা ব্যবসায়ীদের যোগ রয়েছে। উভয় পক্ষই রাজ্যের বেশ কিছু প্রভাবশালীদের সঙ্গে সখ্য রেখে নানা বেআইনি কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। বেশ কিছু ব্যবসায়ীকে সম্প্রতি নোটিশ পাঠিয়েছে সিবিআই। এবার কয়লাকাণ্ডের তদন্ত হাতে নিতে চলেছে সিবিআই। এনামুলকে ইতিমধ্যেই গ্রেপ্তার করেছে সিবিআই। তাঁর বয়ানের সূত্র ধরে সেই মামলায় গত ১৭ নভেম্বর জেরার জন্য কলকাতার নিজাম প্যালেসে ডাকা হয় সতীশকুমারকে। সেখানেই গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে।

রাজ্য পুলিশকে না জানিয়ে আচমকা কেন্দ্রীয় সংস্থার অভিযান কেন? এই প্রশ্ন তুলে সিদ্দিকুল্লার পর এবার মাঠে নামেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচনের মুখে রাজনীতির রং মাখিয়ে জাতীয় নিরাপত্তার সঙ্গে জড়িত বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরির প্রয়াস করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই আচরণ নিয়ে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী যে প্রশ্নগুলি তুলেছেন সাধারণ মানুষের মনেও সেই প্রশ্নগুলিই ঘুরে বেড়াচ্ছে।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর প্রশ্ন, 'সীমান্তে না হয় বিএসএফ টাকা লুঠ করেছে। কিন্তু পুলিশ ও শাসকদলের মদত ছাড়া গোরুপাচার কী করে হতে পারে? গাড়ি করে জাতীয় সড়কের ওপর দিয়ে গোরাপাচার হয়। মানিব্যাগে

করে তো আর গোরুপাচার হয়নি?' অধীরবাবুর দাবি, গোরুপাচারের টাকায় তৃণমূল নেতারা নির্বাচনী তহবিল গঠন করেছেন। এই টাকা গিয়েছে পুলিশের পকেটেও।' এদিন সরাসরি তৃণমূলকে আক্রমণ করে অধীরবাবু বলেন, গোরুপাচারে তৃণমূল নেতাদের কত করে মাসোহারা দিতে হতো ত পুলিশ তো জানেই, সাধারণ মানুষও ভালো করে জানে। মুর্শিদাবাদে তো তা ওপেন টু অল। কলকাতা পুলিশের হেড কোয়ার্টার (লালবাজার) থেকে দিদির দলের জন্য টাকার পাহাড় তৈরি করতে গোরুপাচারের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।' এই লেখা শেষ হওয়া পর্যন্ত অধীর চৌধুরীর বক্তব্য রাজ্যসরকার, রাজ্য পুলিশ কিংবা তৃণমূল কংগ্রেস খণ্ডন করেনি।

এছাড়া মমমতা ব্যানার্জির এই আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। এনামুল গেপ্তারের প্রসঙ্গ টেনে সাংবাদিক সম্মেলনে অমিত শাহ নিজে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলেন, 'ওই ব্যক্তির সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কী সম্পর্ক? উনি কেন বাঁচাতে চাইছেন?' এনামুলের গ্রেপ্তারি নিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে খোঁচা দিলেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসুও। তাঁর শ্লেষাত্মকভঙ্গীতে বলেন, 'কোন শিল্পে অরাজকতা নেই বলুন তো? সকাল-বিকেল এখন সিবিআই তল্লাশি করে হাতেনাতে ধরছে এখানকার গোরুপাচারকারী ও কয়লা পাচারকারীদের। আর তাদের হয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কান্নাকাটি করেন, ত্রাহি ত্রাহি রব করেন, কেন?'

ইসলামিক সন্ত্রাস, গোরুপাচার, জালনোটের কারবার ও মাদ্রাসা নেটওয়ার্ক ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে যে শক্তিশালী পরিকাঠামো তৈরি করে ফেলেছে এটা এতদিন শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু প্রাক্তন বিএসএফ কর্তা সতীশ কুমারের গ্রেপ্তার, আলকায়দা জঙ্গি ও গোরুপাচারের মূল মাথা এনামুলের গ্রেপ্তারি ও কেন্দ্রীয় সংস্থার তল্লাশি নিয়ে মমতা সরকারের গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী এবং শেষে খোদ মুখ্যমন্ত্রী যে ভাবে প্রশ্ন তুলে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন তাতে এটা বোধহয় এটা বলা যায় যে যে দেশ বিরোধী চক্রান্তের শেকড় রাজ্য সরকারকেও গ্রাস করেছে। এই নেটওয়ার্কের জাল ছিঁড়ে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচাতে হলে শুধু সিদ্দিকুল্লা নয় জেরা করা উচিত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। □

শাসকের মদতে পশ্চিমবঙ্গে গোরুপাচারের বাড়বাড়ন্ত

তরুণ কুমার পণ্ডিত

রাজ্য সরকার ও বিএসএফের মদতে দীর্ঘদিন থেকে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলো থেকে বাংলাদেশে গোরু পাচার হয়ে আসছিল। সীমান্তের বেশ কিছু জায়গায় কাঁটাতারের বেড়ার অনুপস্থিতি ও বিএসএফের টহলদারি না থাকায় খুব সহজেই গোরু পাচার সম্ভব হয়। মূলত মালদা, মুর্শিদাবাদ, দুই দিনাজপুর ও দুই চব্বিশপরগনা জেলার স্থল সীমান্ত ও জলপথে প্রতিদিন হাজার হাজার উত্তর ভারতের উঁচু উঁচু গোরু পাচারের ঘটনায় ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা ব্যথিত হয়েছে। গোরু পাচারের ফলে সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে গোরুর পায়ের চাপে কৃষকদের ফসল নষ্ট হয়েছে, সহজলভ্য অর্থ অপরাধ জগতের সঙ্গে যুবসমাজকে যুক্ত করেছে এবং নেশায় আসক্ত করেছে। পাচারকারীরা সীমান্ত অঞ্চলে ইদানীং বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাতেরবেলা কাঁটাতরের বেড়ায় বাঁশের মাচা বানিয়ে যেমন গোরু পাচার করছে তেমনি জলপথে কলার ভেলাতে গোরুগুলোকে বেঁধে ওপারে পৌঁছে দিচ্ছে। বিনিময়ে একটি গোরু পিছু বিএসএফের পকেটে আসে ১০ হাজার এবং রাজ্য পুলিশের মাধ্যমে শাসক রাজনৈতিক নেতারা পায় ১৫ হাজার টাকা। দেখা গেছে এই রাজ্যে ভোটের সময়েও এই গোরু পাচারের টাকায় রাজনৈতিক দলের কোষাগার ফুলে ফেঁপে উঠেছে।

সম্প্রতি বাংলাদেশে গোরু পাচার চক্রের মাস্টার মাইন্ড বলে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলার বাসিন্দা এনামুল হককে সিবিআই গ্রেপ্তার করার পর তার কাছ থেকে অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে উঠে এসেছে। কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বের হয়ে পড়েছে, জল অনেকদূর পর্যন্ত গড়িয়েছে। অর্থাৎ গোরু পাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে হাওলার কোটি কোটি টাকা। হাওলার প্রায় এক হাজার কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে এই গোরুপাচারের আড়ালে বলে তদন্তকারী অফিসাররা জানতে পেরেছেন। তাছাড়া গোরু পাচারের কোটি কোটি টাকা শাসকদলের নির্বাচনী তহবিলে গেছে বলে লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীর চৌধুরী অভিযোগ করেছেন। তদন্তকারী আধিকারিকদের অনুমান, এই গোরু পাচারের মোটা টাকার একটি অংশ পৌঁছে যাচ্ছে জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদী সংগঠনগুলোর হাতে। অথচ রাজ্য পুলিশের কাছে নাকি গোরু পাচারের তেমন কোনো খবর নেই। মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জে সোনার বাংলা হোটেলের মালিক এনামুল হক এখান থেকেই দীর্ঘদিন ধরে তার অবৈধ কারবার চালিয়ে যেতো আর পুলিশ তার কোনো খবর জানতো না, এটা অবিশ্বাস্য।

এদিকে গোরু পাচার চক্রের তদন্ত করতে গিয়ে সিবিআই বিএসএফের কমান্ডেন্ট সতীশ কুমারকে গ্রেপ্তার করেছে। তার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পত্তির হদিশ মিলেছে বলে জানা গেছে।

এনামুল ছাড়াও আনারুল শেখ ও গোলাম মোস্তাফা দুই পাচারকারীর নামও প্রত্যক্ষভাবে পাচারের সঙ্গে জড়িত বলে তদন্তকারী অফিসাররা জানতে পেরেছেন। তারা আটক হওয়া গোরুর দাম কম দেখিয়ে নিজেরা নিলাম করে নিয়ে পরে তা বাংলাদেশে পাচার করতো। সিবিআই গোরু পাচার কাণ্ডের তদন্তের জাল আরও ছড়াতে শুরু করেছে। গোয়েন্দাদের দাবি, শুধু বিএসএফ কমান্ডেন্ট সতীশ কুমার নয় , পাচারের সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিএসএফের ৭ জন ও ৫ জন শুল্ক দপ্তরের আধিকারিক। সেই সূত্র ধরে আসানসোল শিল্পাঞ্চলের বেশ কয়েকজন কয়লা ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে হানা দিয়েছিল আয়কর দপ্তরের আধিকারিকরা। এই গোটা চক্রে যোগসাজশের তথ্য পেয়ে এবার আসানসোলের ৬ জন কয়লা ব্যবসায়ীকে নোটিশ পাঠিয়েছে সিবিআই । অন্যদিকে পাচারের অভিযোগে ধৃত বিএসএফ কমান্ডেন্ট সতীশ কুমার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তাঁর স্ত্রী ও শ্বশুরের কাছে সম্পত্তি ও তার হিসেব রয়েছে বলে সিবিআই-কে জানিয়েছেন। ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতে থাকাকালীন নিজেকে বাঁচাতেই এই কৌশল অবলম্বন করেছিলেন বলে গোয়েন্দাদের দাবি। এছাড়াও সতীশ কুমারের স্ত্রীর সঙ্গে যৌথভাবে এনামূল হকের পরিবারের কলকাতার সল্টলেকে বাড়ি ও ফ্ল্যাট, অমৃতসর, রায়পুর, দিল্লি এবং শিলিগুড়িতে সম্পত্তি ও কারবারের খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু ২০১৬ সালে স্বেচ্ছা অবসরের পর কীভাবে সতীশ কুমার ১৩ কোটি টাকার মালিক হলেন, তা জানতে চান তদন্তকারী অফিসাররা। আরও খবর কুখ্যাত কয়লা ব্যবসায়ী অনুপ মাঝি ওরফে লালার সঙ্গে ওদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হয়েছেন কেন্দ্রীয় সংস্থার এই তল্লাশি নিয়ে। রাজ্য পুলিশকে অন্ধকারে রেখে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে কেন অভিযান চালানো হচ্ছে, সেই প্রশ্নও তিনি তুলেছেন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, মুখ্যমন্ত্রী কথায় কথায় কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন অথচ রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথভাবে কোনো তদন্ত শুরু করলে দোষীদের শনাক্ত করা সম্ভব হয় না। আজ পর্যন্ত তাদের কোনো শাস্তিও হয়নি। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের কড়াকড়ি এবং সীমান্তে বিএসএফের তৎপরতায় ৬০ শতাংশ গোরু পাচার কমে গেছে। বিএসএফের গুলিতে সীমান্তে পাচারকারীদের মৃত্যুর ঘটনাও অনেক বেড়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমাদের রাজ্যে গোরু পাচার এখনও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি এবং এই পাচার চক্রের শিকড় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলোর পরোক্ষ হাত থাকার জন্য ও পাচারের সঙ্গে যুক্ত দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা না নেওয়ার জন্যেই গোপাচার আজও রমরমিয়ে চলছে। যতদিন না কেন্দ্রীয় সরকার রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীক গোসম্পদকে রক্ষা করতে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারবে ততদিন এদেশের সুরক্ষা ও নিরাপত্তার প্রশ্নে আমরা কোনো সদুত্তর দিতে পারবো না। □

২৬ নভেম্বরের ভারত-বনধ সুপার ফ্লপ শো

গত ২৬ নভেম্বর বাঙ্গলা বনধ ছিল আপনি জানেন? যদি নিত্যদিনের খবরের কাগজ পড়া আপনার অভ্যাস হয়, কিংবা নিউজ চ্যানেলে অনবরত নজর রাখা আপনার স্বভাব হয়, তবে আপনি জানতে পারেন সেদিন বিজেপি-বিরোধী ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে সেদিন ভারত-বনধ ছিল। আপনি যদি ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপে দিনের বেশিরভাগ সময় ডুবে থাকেন, তাহলে বুঝবেন ২৬ তারিখ কী মহাপ্রলয় ঘটে গিয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয়, বামপন্থার পুনরুত্থান, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি দেশের মানুষের অনাস্থা, ফলে সরকারের যায়-যায় দশা। তথাকথিত ‘মেহনতি’ মানুষের ক্ষমতায় সরকারের কেঁপে যাওয়া দশা ইত্যাদি সব চমকপ্রদ ন্যারেটিভ। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিটা কিছু অন্যরকম। অধিকাংশ মানুষ পেটের দায়েই এখন রাস্তায় বেরোন। কোভিড আর কিছু না পারুক, মানবজীবনের স্বাভাবিক ছন্দটাকে ধ্বংস করে দিতে পেরেছে। বহু মানুষ কাজ হারিয়েছেন, সরকারের কোষাগারের হালও খুব ভালো কিছু নয়। এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকার দেশের অর্থনীতিকে সচল করবার মরিয়া চেষ্টা করছে। তার সুফলও ইতিমধ্যেই মিলতে শুরু করেছে। তখন এই বনধ নামক ধাষ্টামির কি খুব প্রয়োজন ছিল? সেদিন বাস্তব কী বলছে? যারা নিতান্ত জীবনজীবিকার তাগিদে সেদিন রাস্তায় নেমেছেন, তাদের অস্বাভাবিক কিছু অন্তত চোখে পড়বে না। এই করোনা আবহে নিউ নরম্যালে জনজীবন যতটা স্বাভাবিক থাকা সম্ভব, ঠিক ততটাই স্বাভাবিক ছিল ‘বনধের বাজার’। শুধু বিক্ষিপ্ত কিছু জায়গায় গাজোয়ারি মূলত ট্রেন অবরোধের খবর পাওয়া গিয়েছে ও ধর্তব্যের মধ্যে না পড়া কিছু ঝামেলার। এর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে আলাদা করে কিছু বলতেও হয়নি, কিছু করতেও হয়নি। যা করবার রাজ্যের মানুষই করে দিয়েছেন। তাঁরা জানেন, এরা মুখে

এ দেশের প্রাচীন অরণ্য-প্রবাদ কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। মুশকিল হচ্ছে, বামপন্থীদের ‘দেখে শেখা’ ধাতে নেই, ঠেকেও শিখতে জানে না। তাই পশ্চিমবঙ্গে সাত শতাংশ অবশ্যই প্রাক-অবলুপ্তি পর্যায়ে।

বড়ো বড়ো কথা বলবে, কিন্তু কাজের বেলায় অষ্টরম্ভা। এরা কিছু হলে ‘ভাত দে’ স্লোগান তুলবে, কিন্তু মেহনতি মানুষকে নিজেদের কষ্টের রোজগারেই ভাত জোটাতে হবে।

ধর্মঘটি ট্রেড ইউনিয়নগুলির মূল দাবি ছিল ব্যাঙ্ক, বিমা, রেল ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান বেসরকারিকরণ হতে দেওয়া চলবে না। কারণট আর কিছুই নয়, এটা করলে সাধারণ মানুষের করের টাকা ধবংস করে, কেন্দ্রীয় সরকারের থেকে মাইনে নিয়ে ‘আন্দোলন, আন্দোলন’ খেলা খেলে সাধারণ মানুষকেই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত করে দুর্ভোগের সম্মুখীন করার কাজটা আর হবে না। প্রথমে রটানো হয়েছিল, সরকার সব কিছু নাকি বেচে দিচ্ছে। কিন্তু বিহার ভোটের ফল অন্তত বুঝিয়ে দিয়েছে, এই রটনা জনগণ আর নিচ্ছে না। অর্থনীতিবিদরাও বলে দিয়েছেন, আধুনিক অর্থনৈতিক-ব্যবস্থা বলে সরকার ব্যবসা পরিচালনা করবে না, অর্থাৎ সরকারি সংস্থায় সরকার তার বিনিয়োগ যতটা সম্ভব কমিয়ে আনবে। পরিবর্তে তার দায়িত্ব জনস্বাস্থ্য বা উন্নয়নে অংশ নেওয়া বা আরও আর্থিক বিনিয়োগ করা। তাই সরকার তার বিনিয়োগের নীতিতে কিছু পরিবর্তন করে, যেমন সরকারি সংস্থাগুলিকে বেসরকারি ক্ষেত্রে যেমন বিলগ্নীকরণ করা হয়েছে তেমনি সেই সংস্থগুলির প্রয়োজনীয় সংখ্যক শেয়ারও হাতে রাখা হয়েছে সরকারি নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য। এই সত্যটা চেপে রেখে এতকাল বিরোধীরা একপেশে প্রচার করে এসেছে। আপাতত কিছু সত্য বেরিয়ে পড়ায় ধর্মঘটের দাবির ছলে এই ভোল বদল।

আপাতত এনিয়ে বেশি কথা খরচ করতে চাই না। কারণ বেশ কিছু মিডিয়া এই বনধকে ‘কর্মনাশা’ বলে চালিয়ে প্রকারান্তরে ‘বনধ সফল’ এই বার্তা দিতে চাইলেও আদতে যে এটি একটি সুপার ফ্লপ শো, সেদিন যারা পথে কাজেকর্মে বেরিয়েছিলেন, তাঁরা জানেন। শুধু পাঠককে জানানোর জন্য আরেকটি কথা বলা উচিত। বিক্ষিপ্ত ছবি দেখিয়ে প্রচার করা হচ্ছে কৃষকেরা দিল্লি, হরিয়ানা ইত্যাদি নাকি ‘দখল’ করে ফেলেছে। উপলক্ষ্য কেন্দ্রের কৃষিনীতি। এই ধরনের মিথ্যাচার আগেও দেখা গেছে। মহারাষ্ট্রেও কৃষকের ফাটা খালি পা দেখিয়ে বামপন্থার জয়গান করা হয়েছিল। তারপর ভোটবাক্সে বামপন্থী আর তার দোসরদের করুণ হাল সকলেরই জানা। এ দেশের প্রাচীন অরণ্য-প্রবাদ কেউ দেখে শেখে, কেউ ঠেকে শেখে। মুশকিল হচ্ছে, বামপন্থীদের ‘দেখে শেখা’ ধাতে নেই, ঠেকেও শিখতে জানে না। তাই পশ্চিমবঙ্গে সাত শতাংশ অবশ্যই প্রাক-অবলুপ্তি পর্যায়ে। □

২৬ নভেম্বর স্মরণ বাংলাদেশে

পাকিস্তানকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ঘোষণার দাবি

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ২৬ নভেম্বর বিশ্বে সন্ত্রাসী হামলার ইতিহাসে এক ভয়াবহতম দিন। ২০০৮ সালের এই দিনে ভারতের মুম্বাই শহরে পাঁচতারা তাজ হোটেল-সহ আরও ১২টি স্থানে একযোগে হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তানি সন্ত্রাসীরা। কেড়ে নিয়েছিল দেশি-বিদেশি-সহ ১৬৬ জন নিরপরাধ মানুষের প্রাণ। সন্ত্রাসীরা পাকিস্তান থেকে সমুদ্রপথে এসে মুম্বাই প্রবেশ করেছিল। ভারতের ইতিহাসে ভয়াবহতম এই হামলার ঘটনার আজ এক যুগ পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনো সেই ভয়াবহ হামলার সঙ্গে জড়িতদের সুষ্ঠু বিচার হয়নি।

বাংলাদেশে কিছু সচেতন মানুষ এই দিনে সমাবেশ ও আলোচনায় বলেছেন, এক যুগ পার হলেও পাকিস্তান মুম্বাই বিস্ফোরণের চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। বিচারের নামে চলেছে প্রহসন। বরং ২০০৮ সালের মুম্বাইয়ে ভয়ংকর বিস্ফোরণ ঘটানোর নেপথ্য নায়কেরা পুরস্কৃতও হয়েছে পাকিস্তানে।

বাংলাদেশ সচেতন নাগরিক কমিটির এক প্রতিবাদ সমাবেশে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসী দেশ ঘোষণার দাবি জানিয়ে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের সক্রিয় মদত ও পরিকল্পনায় সন্ত্রাসী ও জঙ্গিগোষ্ঠী বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন স্থানে হামলা ও কর্মকাণ্ড চালিয়ে গোটা উপমহাদেশে এক অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে আসছে। এই ষড়যন্ত্র রুখতে বাংলাদেশের সকল শ্রেণীর প্রগতিশীল, শান্তিপ্রিয় এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মূল্যবোধে বিশ্বাসী মানুষকে সম্মিলিতভাবে এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয় এই সমাবেশে থেকে। সমাবেশে আরও বলা হয়, পাকিস্তান জন্মলগ্ন থেকেই সন্ত্রাসী দেশ। কোনোদিন গণতন্ত্রের দেখা পায়নি পাকিস্তানের মানুষ। সবসময় কিছু রাজনীতিবিদকে সামনে রেখে দেশ শাসন করেছে সেনাবাহিনী। জঙ্গিবাদ তথা সন্ত্রাসবাদ তাদের হাতিয়ার। বাংলাদেশের মানুষ একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে এই সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ভারত মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের পাশে ছিল।

ভারতের মুম্বাইয়ে ২০০৮ সালের ২৬ নভেম্বর পাকিস্তানি জঙ্গি হামলা এবং বাংলাদেশে সন্ত্রাসী ও জঙ্গিবাদী তৎপরতার প্রতিবাদে বাংলাদেশ সচেতন নাগরিক কমিটি গুলশানে পাকিস্তানি হাইকমিশনের সামনে সমাবেশ আয়োজনের ঘোষণা দিলেও পুলিশের অনুরোধে সমাবেশস্থল পরিবর্তন করা হয়। গুলশান দুই নম্বর গোল চত্বরে আয়োজিত এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। বক্তব্য রাখেন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক মোহাম্মদ সালাউদ্দিন, সাংবাদিক বাসুদেব ধর, মোহাম্মদ ইসহাক খান, মতিলাল রায়, অধ্যাপক রজত সুর ও রোপেন রড্রিক্স। সমাবেশ সঞ্চালনা করেন আশরাফ আলি লিয়ন।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে নববর্ষের অনুষ্ঠানে হামলা, ২০০৪ সালে দেশজুড়ে জঙ্গি হামলা, বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে শেখ হাসিনার সমাবেশে গ্রেনেড হামলা, উদীচীর সমাবেশে হামলা এবং ২০১৬ সালে গুলশানে জঙ্গি হামলা সবই এক সূত্রে গাঁথা। শেখ হাসিনাকে অন্তত দেড় ডজন বার প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। সর্বশেষ ষড়যন্ত্র ছিল বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউর সমাবেশে হামলা। এখানে আর্জেস গ্রেনেড হামলায় ২৪ জন নিহত হন। এই আর্জেস গ্রেনেড এসেছিল পাকিস্তান থেকে যা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। নেতাকর্মীরা ঘিরে রেখে নেত্রীর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।

বক্তারা আরও বলেন, পাকিস্তানি জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদকে মদত দিচ্ছে চীন। যেমনটি ১৯৭১ সালে ৩০ লক্ষ বাঙ্গালি হত্যা ও লক্ষ লক্ষ নারী নির্যাতনে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করেছিল চীন। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই দেশটি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। চীনের সহায়তা পেয়ে পাকিস্তান আজও বেপরোয়া। ভারতকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল করতে মুম্বাইয়ে হামলা চালানো হয়েছিল। বাংলাদেশকে পিছিয়ে দিতে এদেশেও বারবার জঙ্গি হামলা ও তৎপরতা চালানো হয়। বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে পাকিস্তানকে পিছিয়ে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। এটা পছন্দ নয়। এই জঙ্গিবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের গণতন্ত্রমনা প্রগতিবাদী মানুষকেও এগিয়ে আসার আহ্বান জানানো হয় সমাবেশে।

পাকিস্তানি জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে আজ ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাব এবং দেশের কয়েকটি জেলায়ও প্রতিবাদ সমাবেশ হয়েছে।

অন্যদিকে মুম্বাইয়ে জঙ্গি সন্ত্রাসী হামলার ১২তম বার্ষিকী স্মরণে একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ২৬ নভেম্বর বিকেলে এক আন্তর্জাতিক ওয়েবিনারের আয়োজন করে। ওয়েবিনারের বিষয় ছিল, ‘উপমহাদেশে ইসলামের নামে জঙ্গি সন্ত্রাসের গডফাদার পাকিস্তান।’ সংগঠনের সভাপতি লেখক সাংবাদিক শাহরিয়ার কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই ওয়েবিনারে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, শিক্ষাবিদ মুহম্মদ জাফর ইকবাল, অধ্যাপক মেজবাহ কামাল, ব্যারিস্টার ড. তুরিন আফরোজ, ডাঃ মামুন আল মাহাতাব স্বপ্নীল, লেখক রসুল, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক দিব্যেন্দু দীপ, গবেষক তাপস দাস, আক্তার এম জামান, সমাজকর্মী হাসনাত ফারুক শিমুল রবিন, মানবাধিকারকর্মী আনসার আহমদ উল্লাহ, মুক্তিযোদ্ধা সুব্রত চক্রবর্তী, ডাঃ মফিজুল ইসলাম মান্টু, সংস্কৃতিকর্মী জ্যোতি আহমেদ, অ্যাডভোকেট দীপক ঘোষ ও কাজী মুকুল।

সভাপতির প্রারম্ভিক ভাষণে শাহরিয়ার কবির বলেন, ভারতের পক্ষ থেকে হামলার

ব্যাপারে প্রামাণ্য নথিপত্র দেওয়া হলেও পাকিস্তানি সরকার লোক দেখানো কিছু বিবৃতি দেওয়া ছাড়া কোনও শাস্তি দেয়নি মুম্বাইয়ের সন্ত্রাসী হামলাকারীদের। বাংলাদেশ-সহ দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণা করলেও এবিষয়ে সেনাবাহিনী পরিচালিত পাক-সরকারের কোনও মাথাব্যথা নেই। মুম্বাই হামলা নিয়ে ইসলামাবাদের আচরণ প্রমাণ করছে মুম্বাইয়ের ২৬/১১ হামলা ছিল পাকিস্তানের সরকারি মদতে ভয়ংকর এক সন্ত্রাসী হামলা ও হত্যাকাণ্ড। মুম্বাই হামলা যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই-এর মদতেই হয়েছিল, সেটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছেও আজ স্পষ্ট। তাই হামলার মূল চক্রী, লস্কর-ই-তৈবা (এলইটি)-র প্রধান হাফিজ সঈদ ও তার সঙ্গীদের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখতে ব্যস্ত ইসলামাবাদ।

বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যাকাণ্ড থেকে আরম্ভ করে গত চল্লিশ বছরে বিভিন্ন হত্যা ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামি এবং পাকিস্তানের আইএসআই-এর সম্পৃক্ততার কথা উল্লেখ করে শাহরিয়ার কবির আরও বলেন, এখন সময় এসেছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রবল জনমত সৃষ্টি করা, যাতে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসী দেশ এবং জামায়াতে ইসলামিক সন্ত্রাসী সংগঠনের তালিকাভুক্ত করা হয়। অন্যথায় ইসলামের নামে জঙ্গি মৌলবাদী সন্ত্রাসী হামলা উপমহাদেশ-সহ সারা পৃথিবীতে বার বার ঘটবে।

বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক বলেন,জাতিসঙ্ঘের পক্ষ থেকে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসী দেশ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া এখন সময়ের দাবি। কিন্তু চীনের কারণে সেটি সম্ভব হচ্ছে না। পাকিস্তান চীনের অস্ত্র বিক্রির বিশাল বাজার, ফলে চীন সবসময় ভেটো দিয়ে পাকিস্তানকে রক্ষা করে। পাকিস্তান দক্ষিণ এশিয়ায় তথা সারা পৃথিবীতে জঙ্গিবাদী সন্ত্রাস রপ্তানি করছে। ২১ আগস্ট শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলা থেকে শুরু করে বাংলাদেশে প্রতিটি জঙ্গি হামলার সঙ্গে পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই এবং আইএসআই মদতপুষ্ট জামায়াত ইসলামি জড়িত।

কথাসাহিত্যিক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাফর ইকবাল বলেন, এদেশে জঙ্গি কারা, জঙ্গিদের কারা মদত দেয় তা আমরা জানি। ধর্ম তাদের হাতিয়ার, 'নাস্তিকতা' তাদের একটি অজুহাত। কাউকে নাস্তিক আখ্যা দিতে পারলে কাজটা তাদের জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। মুক্তিযুদ্ধের

পক্ষে যারা কথা বলবে, আমাদের বাঙ্গালি সংস্কৃতির পক্ষে যারা কথা বলবে তারা তাদের শত্রু। ফলে তরুণ প্রজন্মকে আমাদের বোঝাতে হবে যে, পাকিস্তান একটি সন্ত্রাসী দেশ, যারা পবিত্র ইসলাম ধর্মকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে '৭১-এ এদেশে গণহত্যা চালিয়েছিল। ওরা এখন একেবারে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। আমাদের দেশটা যেন ওদের মতো না হয়ে যায়।

নির্মূল কমিটির সাধারণ সম্পাদক সমাজকর্মী কাজী মুকুল বলেন, শহীদ জননী জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে নির্মূল কমিটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে তখনই মাঠে নেমেছিল যখন মৌলবাদীদের ভয়ে কোনো রাজনৈতিক দল মাঠে নামতে সাহস করছিল না। সুতরাং আবারও আমাদের সরব হতে হবে। ডিসেম্বরের ১ তারিখ থেকে আমরা আবার মাঠে নামছি। বিজয়ের মাসে আমরা স্বাধীনতার শত্রুদের রাস্তায় নামতে দেব না।

গণমাধ্যমে বিশেষ প্রতিবেদনে ২৬ নভেম্বরের ঘটনা বর্ণনা করে বলা হয়েছে, ওইদিন রাত ৮টায় ভারতের বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বাইতে হামলা চালায় পাকিস্তান থেকে স্পিডবোটে করে আসা ১০ জঙ্গি। প্রথম হামলাটি চালায় ছত্রপতি শিবাজী রেলওয়ে স্টেশনে। এরপর কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে একে একে তাজ হোটেল, লিওপোল্ড ক্যাফে, ওবরয় ট্রাইডেন্ট, নরিম্যান হাউজে সন্ত্রস্ত হামলার পাশাপাশি ২টি ট্যাক্সিতে টাইমবোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ভয়াবহ এই সন্ত্রাসী হামলায় সেদিন প্রাণ হারিয়েছিল ৩০ জন বিদেশি-সহ ১৬৬ জন। ভয়াবহ এই হামলার ঘটনায় সারাবিশ্বের নজর ছিল তখন টিভির পর্দায়।

হামলার সময় আজমল কাশভ নামে এক জঙ্গি ধরা পড়ে, যার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ২০১২ সালে। কাশভের কাছ থেকেই এই হামলায় জড়িতদের সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গিয়েছিল। হামলার পরিকল্পনার সঙ্গে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার দীর্ঘ কর্মকর্তা-সহ জঙ্গিগোষ্ঠী লস্কর-ই-তৈবার জড়িত থাকার অভিযোগ থাকলেও এখনো তারা রয়ে গেছে ধরাছোঁয়ার বাইরে।

আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ২০০৯ সাল থেকে পাকিস্তানের সন্ত্রাসবিরোধী আদালতে মামলা হলেও, আজ পর্যন্ত কাউকে বিচারের আওতায় আনতে পারেনি পাকিস্তান। পাকিস্তানে এই মামলার কোনো বিচার না হলেও, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ২৬/১১ দিনটি সন্ত্রাসবিরোধী এক দিবস হিসেবে ক্রমশই পরিচিত হয়ে উঠছে।

ভারতের মুম্বাইয়ের তাজ হোটেলে হামলায় নিহতদের স্মরণ করলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার বিক্রম দোরাইস্বামী। টুইটারে তিনি মুম্বাই হামলার বার্ষিকী স্মরণ করেন। টুইটারে তিনি লেখেন, ২৬/১১ কখনওই ভুলব না। কখনওই ক্ষমা করা হবে না। আমরা সব সময় স্মরণ করব।

তিনি মুম্বাই হামলা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তরের দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া বিভাগের একটি টুইট রিটুইট করেছেন। যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্র দপ্তর টুইটারে জানিয়েছে, মুম্বাই হামলার ১২তম বার্ষিকীতে ৬ আমেরিকান নাগরিক-সহ ক্ষতিগ্রস্তদের বিচারে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র-ভারত একযোগে কাজ করবে। □

আত্মনির্ভর কৃষি ব্যবস্থার পথে ভারত

অনু বর্মণ

বিরোধীরা কৃষি বিলের বিরোধিতায় সোচ্চার। এতে কৃষকস্বার্থ গৌণ। কোনও কৃষক কি তাঁর ট্রাক্টর পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানাবেন? অন্য কোনো ইস্যু না থাকায় হঠাৎ করে কৃষকদরদি হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করার জন্যই তাঁরা ময়দানে নেমে পড়েছেন।

গত জুন মাসের প্রথমদিকে কৃষি সংক্রান্ত তিনটি অধ্যাদেশ জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। সংসদের অধিবেশন শুরু হতেই লোকসভায় সেইসব বিল পাশ করিয়েছে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার। রাজ্যসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ হয় তিনটি বিল। তিনটি বিল হলো **অত্যাবশ্যক পণ্য আইন সংশোধন, কৃষিপণ্য লেনদেন ও বাণিজ্য উন্নয়ন এবং কৃষিপণ্যের দামে সুরক্ষা এবং কৃষক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি এবং চুক্তি চাষ।** অত্যাবশ্যক পণ্য আইন সংশোধন বিলে বলা হয়েছে ইচ্ছেমতো খাদ্যশস্য মজুদ করা যাবে। শুধুমাত্র জরুরি পরিস্থিতিতে (যুদ্ধ, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, খরা) বা বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম খুব বাড়লে সরকার মজুতের পরিমাণ বেঁধে দিতে পারে। কৃষি পণ্যের দাম সংক্রান্ত বিলে বলা হয়েছে সরকার নিয়ন্ত্রিত মান্ডির বাইরেও চাষিরা তাদের শস্য যে কোনো সংস্থাকে বিক্রি করতে পারবেন। চুক্তিচাষ সংক্রান্ত বিলটিতে চাষি ও ক্রেতার মধ্যে চুক্তিভিত্তিক চাষে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে।

কৃষিতে এপিএমসি(এগ্রিকালচারাল প্রডিউস মার্কেট কমিটি) তথা কৃষিপণ্যের নিয়ন্ত্রিত বাজারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব নিয়ে বহুদিন থেকেই প্রশ্ন উঠছে। 'এপিএমসি' মূলত কৃষিতে লাইসেন্স রাজের দ্যোতক। দেশের কৃষকরা তাঁদের উৎপাদিত কৃষিপণ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত বাজারে বিক্রি করতে পারেন। এই বাজারগুলোতে নিয়ন্ত্রণ থাকে ফড়ে এবং একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর হাতে। বাজারে হাজার হাজার বিক্রেতা থাকলেও কৃষি পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রিত হয় একটা অদৃশ্য হাতে। কৃষিপণ্যকে নিয়ে গড়ে উঠেছে ছোটো, মাঝারি ও বৃহৎ দালালচক্র। এদের সঙ্গে রয়েছে রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা। ২০০৬-এ বিহার 'এপিএমসি' অ্যাক্ট বাতিল করেছে। তারপর থেকে দুগ্ধজাত পণ্য ও মধু বিক্রিতে চাষিরা ক্ষতির মুখ দেখেননি।

ফড়ে ও দালালদের বাদ দিয়ে কৃষকরা সরাসরি পণ্য বিক্রি করতে পারলে তা খুবই ভালো বিষয়। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বক্তব্য হচ্ছে রাজ্যের এগ্রিকালচার প্রডাক্ট মার্কেটিং কমিটির ক্ষমতা খর্ব হবে না। মান্ডির বাইরে কোনো কৃষিপণ্য লেনদেনে কেন্দ্রীয় বা রাজ্যকর থাকবে না।

কর্পোরেট সংস্থা কৃষি পণ্যের বাজারে এলে প্রতিযোগিতা হবে। এই প্রতিযোগিতায় কৃষকও ফসলের দাম এখনকার চেয়ে বেশি পাওয়ার সুযোগ পাবেন। বেসরকারি লগ্নি আসবে। গড়ে উঠবে হিমঘরের শৃঙ্খল। হিমঘরের শৃঙ্খল গড়ে উঠলে শাকসবজির পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে না। অপচয় বন্ধ হবে, দামও কমবে। গ্রামের মধ্যে গুদাম ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে উঠবে। কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। ফড়েদের দাপাদাপির ফলে চাষিরা যে আলু ৮ বা ১০ টাকা দরে প্রতি কেজি বিক্রি করেছেন, সেই আলু ক্রেতারা এখন ৩৫ থেকে ৪০ টাকা কেজি দরে কিনতে বাধ্য হচ্ছেন। কৃষক দরদিরা এ বিষয়ে কেন নির্বাক ভূমিকা পালন করছেন?

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের চুক্তি চাষ সংক্রান্ত বিলটিতে চুক্তি চাষকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। চুক্তি চাষ এখন ভারতীয় কৃষিতে অপরিহার্য একটি বিষয়। মৌখিক চুক্তির জায়গায় বিষয়টি লিখিত পঠিত হলে কৃষকদের স্বার্থ সুরক্ষিত থাকবে। তবে সমস্যা হচ্ছে চুক্তি চাষে কোনো বিষয় নিয়ে কৃষক ও ব্যবসায়ীর মধ্যে বিরোধ হলে তার মীমাংসা কীভাবে হবে। এক্ষেত্রে ওই বিবাদ নিয়ে সংশ্লিষ্ট কৃষক আদালতের দ্বারস্থ হতে পারবেন না। বিবাদের মীমাংসা করবেন মহকুমাশাসক বা জেলাশাসক।

ব্রিটিশ জমানায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কালোবাজারি ও মজুতদারি রুখতে আইন জারি হয় ও পরে তা উঠে যায়। স্বাধীনতার পর কালোবাজারি ও বেআইনি মজুতদারি রুখতে ১৯৫৫ সালে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন জারি হয়। ২০২০-তে নতুন আইন অনুযায়ী অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকা থেকে বাদ গেল চাল, ডাল, আলু, পেঁয়াজ, গম, তৈলবীজ, ভোজ্যতেল প্রভৃতি।

কেন্দ্রীয় সরকারের দাবি দেশ এখন খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। মান্ধাতা আমলে যখন দেশে খাদ্য সংকট মেটাতে বিদেশ থেকে গম প্রভৃতি আমদানি করতে হতো সেই সময়ে তৈরি ওই অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের এখন আর কোনো যৌক্তিকতা নেই। এখন খাদ্যশস্য ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের দেশের বাজারে বিক্রি বাড়াতে ও বিদেশে রপ্তানি করতে প্রয়োজন ওই আইন শিথিল করা, যাতে খাদ্যপণ্য ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বেসরকারি সংস্থাগুলোকে আর আইনের ভয়ে লগ্নিবিমুখ না হয়ে থাকতে হয়। তবে নতুন আইনে যে কোনও পণ্যকে অত্যাবশ্যক হিসেবে চিহ্নিত করে সরকার তার মজুতে ঊর্ধ্বসীমা জারি করতে পারে। ওই পণ্যের উৎপাদন, সরবরাহ ও বণ্টনে নিয়ন্ত্রণ জারি করতে পারে।

নতুন বিল কার্যকর হলে বর্তমান ন্যূনতম সহায়ক মূল্য ব্যবস্থা উঠে যাবে বলে পঞ্জাব, হরিয়ানার কৃষকরা যে আশঙ্কা করছেন তা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন প্রখ্যাত কৃষি বিশেষজ্ঞ ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর রিসার্চ অন ইন্টারন্যাশানাল ইকনোমিক রিলেশন্স-এর ইনফোসিস চেয়ার প্রফেসর অশোক গুলাটি। সংসদে কৃষিবিল পাশকে তিনি ১৯৯১ সালের ভারতীয় অর্থনীতির উদারিকরণের সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি মন্তব্য করেছেন এর ফলে কৃষকরা শুধু কোন ফসল উৎপাদন করবেন সেই বিকল্প স্থির করার স্বাধীনতায় পবেন। এবার তাঁরা সরাসরি রপ্তানিকারী, খুচরো ব্যবসায়ী, এমনকী খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ সংস্থাকে নিজেদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। এর ফলে কৃষকরা তাঁদের ফসলের উচিত দাম পাবেন। গুলাটি এও মনে করেন, উপযুক্ত মজুতের অভাবে এতদিন যে লক্ষ লক্ষ টন কৃষিপণ্য নষ্ট হয়ে যেত, সেটা অনেক কমে যাবে বিল কার্যকর হলে। সেক্ষেত্রে সাধারণ উপভোক্তাদের জন্য কৃষি পণ্যের দামও কমবে। ▯

কৃষকদের স্বার্থেই মোদী সরকারের কৃষি বিল

সোমনাথ গোস্বামী

গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে ভারতবর্ষের তথাকথিত রাজনৈতিক দলগুলির প্রবল অনীহা। দীর্ঘদিনের অচলায়তনকে আঁকড়ে ধরে ভোটব্যাঙ্ক নির্ভর রাজনীতিই তাদের একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। মোদী সরকারের কৃষি বিল নিয়ে সম্প্রতি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে আবারও একবার উপরের চিত্রটি পরিষ্কার হয়। আজ যারা এই বিলের বিরোধিতা করে দেশ জুড়ে আন্দোলন করছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমার কিছু অপ্রিয় প্রশ্ন। স্বাধীনতার পর থেকে আপনারা কৃষকদের কল্যাণে যদি এতো তৎপর ছিলেন তবে স্বাধীনতার সাত দশক পরেও কেন এই দেশে প্রতি বিয়াল্লিশ মিনিটে একজন কৃষক আত্মহত্যা করে? কেন দেশের ৪০ শতাংশ কৃষক কৃষিকাজ ছেড়ে অন্য যে কোনও পেশায় যেতে চান? কেন মোট চাষযোগ্য জমির পরিমাণের নিরিখে আমরা বিশ্বে সপ্তম হলেও একর প্রতি উৎপাদনে আমাদের স্থান আফ্রিকার কিছু দেশেরও নীচে? আমাদের কাছে এতো শস্যশ্যামলা ভূমি থাকা সত্ত্বেও বিশ্বের খাদ্যশস্য রপ্তানির বাজারে আমাদের উপস্থিতি কেন নগণ্য? উপরের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর এদেশের প্রথম

> **শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করছে বিরোধীরা।**
>
> — কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী

সারির প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কাছেই আছে। তারা জানেন এদেশে প্রতি বছর ৯০০০০ কোটি টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য মজুত করার পরিকাঠামোর অভাবে নষ্ট হয়। তারা এটাও জানেন এদেশের কৃষকদের মাথাপিছু জমির পরিমাণ মাত্র ১.০৮ হেক্টর, এত স্বল্প জমিতে শুধুমাত্র গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষ করে কোনও কৃষক সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারার মতো আয় করতে পারেন না। কিন্তু নেতারা জ্ঞানপাপী। তারা সব জেনেও কিচ্ছুটি করবেন না। কারণ কৃষক যত গরিব হবে সে যত সরকারের উপর নির্ভরশীল হবে, ততো তাকে সামান্য কিছু দান খয়রাত করে তার ভোটটা খুব সহজে পাওয়া যাবে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে যেখানে উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রীর প্রায় ৫০ শতাংশ প্রক্রিয়াকরণের ব্যবস্থা আছে, আমাদের দেশে তা ৫ শতাংশ। কেন এই অবস্থা? কারণ স্বাধীনতার পর থেকে কৃষিক্ষেত্রে সেই অর্থে কোনো বেসরকারি বিনিয়োগ হয়নি আর

বিনিয়োগ হয়নি কারণ কোনো বেসরকারি সংস্থা কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি চুক্তির ভিত্তিতে ফসল ক্রয় করতে পারতো না।

ভারতের কৃষকদের আর্থিকভাবে সাবলম্বী করতে গেলে তাদের সংগঠিত করে সঙ্ঘবদ্ধ কৃষিকাজ ও উদ্যানপালন ছাড়া অন্য কোনও রাস্তা নেই। সঙ্ঘবদ্ধ পদ্ধতিতে চাষ করলে তারা স্বল্পমূল্যে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত হতে পারবে, ফলে একর প্রতি ফলন বাড়বে ও পূর্বনির্ধারিত মূল্যে চুক্তি চাষ করলে ফসল উৎপাদনের পর তা বিক্রি করার দুশ্চিন্তা থেকে কৃষকরা মুক্তি পাবে। মোদী সরকারের প্রস্তাবিত তিনটি কৃষি বিল ঠিক এই জিনিসটাই মাথায় রেখেই করা হয়েছে।

প্রথমটি হলো ফার্মারস প্রোডিউস ট্রেড অ্যান্ড কমার্স বিল। এই বিলে এপিএমসি আইনকে কিছুটা বদলে কৃষকদের দেশের যে কোনও জায়গায় নিজের উৎপাদিত ফসল বিক্রির স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। এতদিন কৃষকরা শুধুমাত্র সরকার নির্ধারিত কৃষিবাজারে ফসল বিক্রি করতে পারতো। এখন সেই ব্যবস্থার পাশাপাশি খোলা বাজারে দেশের যে কোনও প্রান্তে ফসল বিক্রির স্বাধীনতা পেল কৃষকরা, ফলে তাদের কাছে বিরাট বাজার উন্মুক্ত হলো যাতে তাদের নিজেদের ফসলের দর কষাকষির জায়গাটা মজবুত হলো।

দ্বিতীয় বিলটি হলো ফার্মারস এগ্রিমেন্ট অন প্রাইস অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড ফার্ম সার্ভিস বিল যা কৃষকদের চুক্তিচাষকে বৈধতা দিল। যে কোনো চুক্তির ক্ষেত্রে কৃষকদের স্বার্থ যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য এই বিলে মহকুমাশাসকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠনের কথা বলা হয়েছে।

তৃতীয় বিলটি হলো এসেনসিয়াল কমডিটিস আমেন্ডমেন্ট বিল। যেটা নিয়ে বিরোধীদের বিস্তর অভিযোগ। এর ফলে নাকি খাদ্যদ্রব্যের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যাবে। তাদের কাছে জানতে ইচ্ছে করে এখন তো রাজ্যে বিলটি লাগু হয়নি তাও কেন প্রতি বছর আলু, পেঁয়াজ, টমেটো-সহ অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় সবজির দামে লাগাম টানতে মুখ্যমন্ত্রীকে বাজারে বাজারে ঘুরতে হয়? কারণটা পরিষ্কার, আগেই বলেছি আমাদের দেশে কৃষিপণ্য সংরক্ষণের পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে, ফলে ফসল উৎপাদনের মরশুমে বাজারে প্রচুর জোগানের কারণে কৃষকদের স্বল্পমূল্যে তা বিক্রি করতে হয়। অন্যদিকে অসময়ে জোগান কম থাকার জন্য বাজারে সবজি অগ্নিমূল্য হয়ে যায়। এখন কোনো সরকারের পক্ষেই দেশের উৎপাদিত সমস্ত ফসলের সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়, তার জন্য প্রয়োজন বেসরকারি পুঁজি। কিন্তু কোনো বেসরকারি সংস্থা কয়েক হাজার কোটি টাকা খরচ করে সংরক্ষণের পরিকাঠামো কেন তৈরি করবে যদি তারা ইচ্ছেমতো মজুত করার স্বাধীনতা না পায়?

তাই অত্যাবশ্যক পণ্যের আইন বদলের দরকার ছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, খাদ্য নিরাপত্তা বলে কিছু থাকবে না। কোনো খাদ্যদ্রব্যের মূল্য দ্বিগুণ হয়ে গেলে সরকারের তার মূল্য নির্ধারণে হস্তক্ষেপ করার কথা সংশোধিত আইনে বলা আছে। এ তো গেল বিলের কথা যা সংবাদমাধ্যমে আলোচিত হচ্ছে। কিন্তু সংবাদমাধ্যম যা দেখাচ্ছে না তা হলো কেন্দ্রীয় সরকার ৫০০০ কোটি টাকা খরচ করে ২০২৪ সালের মধ্যে দেশ জুড়ে ১০ হাজার ফার্মারস প্রডিউসার অর্গানাইজেশন তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে। এছাড়া এক লক্ষ কোটি টাকার একটি কৃষি পরিকাঠামো তহবিল গঠন করা হয়েছে। অর্থাৎ কৃষকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে তাদের আধুনিক প্রযুক্তি, সার, বীজ কীটনাশক স্বল্পমূল্যে পাওয়ায় ব্যবস্থা করিয়ে তাদের জমির উৎপাদন ক্ষমতা ও ফসলের গুণগতমান বাড়িয়ে তাদের উৎপাদিত শস্যের উপযুক্ত মূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা— এই পুরো প্রক্রিয়াটা নিরঙ্কুশ ভাবে সংগঠিত করতে যা যা করার দরকার সেটা করার চেষ্টা হয়েছে। যারা বলছেন চুক্তি চাষে নাকি কৃষকরা কর্পোরেটদের ক্রীতদাসে পরিণত হবে তারা হয়তো জানেন না এদেশের ৬৬ শতাংশ পোল্ট্রি ও ৯০ শতাংশ কফি চুক্তির ভিত্তিতে চাষ হয় যাতে কৃষকরা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছে।

এছাড়া ITC Choupal প্রায় দুদশক ধরে ৪০ লক্ষ কৃষকদের সংগঠিত করে তাদের উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্য সরাসরি কিনে নিয়ে তাদের আয় যথেষ্ট পরিমাণে বাড়াতে সাহায্য করেছে। কাজেই বেসরকারি সংস্থা কৃষি ব্যবস্থায় ঢুকলে কৃষকরা আরও অসহায় ও দুর্বল হবে এটা ভাবার কোনও কারণ নেই। আর খাদ্যদ্রব্যের বাজারকে একচেটিয়াকরণ করে কর্পোরেটগুলো নাকি খাদ্যদ্রব্যের দামকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে চলে যাবে বলে যে ভয় দেখানোর চেষ্টা হচ্ছে তা যে কতটা অন্তঃসারশূন্য তার একটা উদাহরণ হলো মধু।

মধু উৎপাদনের সঙ্গে এদেশে মাত্র আড়াই লক্ষ মানুষ যুক্ত আছে এবং মৌমাছি পালন ও মধু সংগ্রহ করার কাজটি দেশের বিরাট ভৌগোলিক অঞ্চলজুড়েও হয় না, তা সত্ত্বেও মধুকে কোনও কর্পোরেট আজ পর্যন্ত একচেটিয়া করতে পারলো না আর ধান, গম, পেঁয়াজ, আলু ডালের মতো ফসলে যেখানে কোটি কোটি মানুষ যুক্ত, প্রতিটি রাজ্যে এমনকী প্রতিটি জেলায় যে ফসলের গুণগত চরিত্র আলাদা এবং যে ফসলগুলোকে গুদামজাত করতে কয়েক লক্ষ কোটি বিনিয়োগ দরকার তা কী করে একচেটিয়া করা যায় তার উত্তরটা কি বিরোধী দলগুলি দেবেন? কাজেই শুধুমাত্র বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করা বন্ধ করুন। আত্মনির্ভর হওয়ার পথে দেশের সঙ্গী হতে না পারলে অন্তত নিষ্ক্রিয় রাখুন, অন্তরায় হবেন না, তাহলে ইতিহাস আপনাদের ক্ষমা করবে না। ▯

ALWAYS EXCLUSIVE
Vandana®
SAREES • SUITS
Mfg. of Cotton Printed & Embroidary Sarees
Contact No. : 033-22188744 / 1386

দেশটা ভারতবর্ষ বলেই তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা পার পেয়ে যান

রঞ্জন কুমার মণ্ডল

'দুর্জনঃ পরিহর্ত্তব্যো বিদ্যায়ালঙ্কৃতোহপি সন্।
মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ।।'

অর্থাৎ— 'বহুমূল্য মণিতে বিভূষিত হলেও সর্প যেমন ভয়ংকর, সেরূপ বিদ্যায় শোভিত দুষ্ট লোকও ভয়াবহ। প্রাণভয়ে হিংস্র সর্পের কাছে যেমন কেউ যায় না, তদ্রূপ দুর্জনের নিকট যাওয়া উচিত নহে।' (চাণক্য)

বেশ কয়েক বছর ধরে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, দেশের কিছু বুদ্ধিজীবী এই দেশটাকে বসবাসের অনুপযুক্ত মনে করছেন। কখনও বিবৃতি দিয়ে, কখনও প্রতিবাদ জানিয়ে, কখনও পদক প্রত্যাখ্যান করে, আলোচনা,বিতর্কসভায় জাতীয়তাবাদী ব্যক্তিদের আদ্যশ্রাদ্ধ করে, নজর কাড়তে উদ্যত হয়েছেন। তারা ভুলে গেছেন এই দেশটা ভারতবর্ষ বলেই এমনটা বলে বা করে পার পাওয়া যায়। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশ হলে কী হতো তা তারাও জানেন। এই দেশটা আছে বলেই তাদের শিক্ষাদীক্ষা, রুটি-রুজি, ঠাটবাট, পাণ্ডিত্যের এত কচ্‌কচানি। মনে হয় এরা গণতন্ত্র, বাক্‌স্বাধীনতা, শিল্পের স্বাধীনতার নামে দেশ বিরোধিতার ঠিকাদারি নিয়ে বসে আছেন। পশ্চিমবঙ্গ নামক রাজ্যটি না থাকলে কোথায় থাকত তাঁদের এত বাহাদুরি?

স্মৃতির জানালা খুলতেই বড্ড লজ্জাজনক বিষয় চোখের সামনে ভেসে উঠল। (১) বিখ্যাত সংগীত পরিচালক একটি বাংলা সিনেমায় একটি কীর্তন যুক্ত করেছিলেন। নায়ক মঞ্চে নেচে কুঁদে গাইছেন— 'ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে...।' সঙ্গে বেশ কয়েকজন আইটেম গার্লস্ (ক্যাবারে) নায়কের তালে তালে নাচছে আর নায়ক মাঝে মাঝে ধ্বনি দিচ্ছে— 'কৃষ্ণ করলে লীলা, আমরা করলে বিলা...'ইত্যাদি। এ কোন সংস্কৃতি? তাদের জানা কি নেই গৌরাঙ্গ কোনো রকস্টার নন, ইনি যুগাবতার ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু?

(২) বিরল প্রজাতির এক কবি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে উত্তরপ্রদেশের সরকার পরিবর্তনের পর ১৯ মার্চ রাত্রি ৮-২৫ মিনিটে ফেসবুকে একটি কবিতা পোস্ট করেন। ১২ পঙ্‌ক্তির কবিতার শেষে অবমাননা করা হয়েছে ধর্মের ত্রিশূলের। এটা নাকি আবার কবিতা! 'বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণ' গ্রন্থে বলা হয়েছে— 'ন কবের্বর্ননং মিথ্যা, কবি সৃষ্টি করঃ পরঃ/ সকোপর্যেব পশ্যন্তি কবয়েহণ্যে ন চৈব হি।' অর্থাৎ 'কবির বর্ণনা মিথ্যা নয়, কবিই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিকর। কবিদের দৃষ্টি সকলের দৃষ্টির উপরে, আর কেউ তেমন দেখে না।' এ কোন দৃষ্টি, যেখানে হিন্দুদের ভাবাবেগে আঘাত করার জন্য ত্রিশূলের অবমাননা করা হয়?

(৩) ভারতের প্রাক্তন এক উপরাষ্ট্রপতি মহাশয়ের অবসরের পর মনে হলো এ দেশ খুবই অসহিষ্ণু। তাঁর এ ভাবনার উদয় যদি চেয়ারে বসার আগে হতো তাহলে মানা যেত। সিনেমা জগতের কারো কারো মনে হচ্ছে এদেশে আর থাকা যাবে না। কোনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ ছাড়াই এমন মন্তব্য ও আচরণ লজ্জাজনক নয় কি? আসলে তারা এ দেশটাকে নিজের দেশ বলে মনেই করেন না, শুধু অর্থ উপার্জন ও বিলাসিতার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেন।

(৪) উত্তরপ্রদেশের মোজাফফরনগর হত্যাকাণ্ডের জন্য ২০১৫ সালে যারা 'অসহিষ্ণুতা'র নাটক মঞ্চস্থ করলেন, ২০২০-র ১৬ এপ্রিল মহারাষ্ট্রের পালঘরে দুজন সন্ন্যাসীকে পিটিয়ে মারার পর বহুদিন কেটে গেলেও তাদের মুখে কথা নেই। কারণটা স্পষ্ট— উত্তরপ্রদেশে মৃত আখলাক মুসলমান এবং এই পালঘরের দুই সন্ন্যাসী হিন্দু।

(৫) ২০১৯-এর ২৩ জুলাই স্বঘোষিত কিছু বুদ্ধিজীবী প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে এক পত্রাঘাত করেছিলেন অসহিষ্ণুতা ও বাক্‌স্বাধীনতা বাধাপ্রাপ্ত হবার অজুহাতে। বর্তমান সরকারের সময়কালে নাকি দেশে অরাজকতা, দলিত ও সংখ্যালঘু সমাজের উপর অত্যাচারে তারা মর্মাহত হয়ে পড়েছেন। পরে এর বিরুদ্ধে একদল জাতীয়তাবাদী মানুষ পালটা পত্র প্রধানমন্ত্রীর নিকট পাঠানোর পর আর কারো মুখে কথা ফোটেনি। আসলে এতকাল ফাঁকা মাঠে গোল দিতেন বলেই সব খেলায় বাহাদুরি দেখাতেন, কিন্তু সময় বদলেছে, মানুষ

> **নেতাজী ছিলেন তোজের কুকুর, বিশ্বাসঘাতক। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি, বড়লোকের কবি, রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ মৃগী রোগী। বিবেকানন্দ বেকার যুবক, চাকরি না পেয়ে সাধু হয়েছেন ইত্যাদি। এসবের পেছনে রয়েছে সুনিয়োজিত চক্রান্ত করার অভিযোগ, যার উদ্দেশ্য দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করা।**

তাঁদের ভণ্ডামি ধরে ফেলেছেন।

এই পণ্ডিতেরা একসময় স্ট্যালিন, লেনিন, মার্কস, এঙ্গেলসদের ভক্ত ছিলেন। ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে চীন বিপ্লবের পর অনেকে মাও-সে-তুং, লিন পিয়াও প্রমুখর শিষ্য হয়েছিলেন। এদের অনেকেই অক্সফোর্ড, দিল্লি, জেএনইউ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো নামি-দামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও অধ্যাপক এবং রোমিলা থাপার, ইরফান হাবিব, বিপান চন্দ্রের মতো ঐতিহাসিক। কিন্তু নব্বইয়ের দশকে হঠাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন (ইউএসএসআর), জার্মানি-সহ বহু রাষ্ট্রের পরিবর্তন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবীর দল ডিগবাজি খেয়ে বেজিং ঘুরে মস্কো থেকে মক্কা পৌঁছে গেলেন। তাছাড়াও এদেশের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের বদান্যতায় পূর্বে যা যা ঘটেছে (১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশের বিভাজন, দাঙ্গা হাঙ্গামা) পুনরায় সেই পথ প্রশস্ত করতে রাজাকার, পঞ্চমবাহিনীর মতো ভূমিকা পালনে ব্রতী হয়েছেন। এরা ভারতীয় দর্শনকে উপেক্ষা করে বিদেশের ধার করা মতবাদকে উচ্চ আসনে বসিয়ে ভারতীয় সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিভাজনের পথে চালিত করে চলেছে। এমনকী হাজার হাজার বছরের সাধু-সন্ত, ঋষি- মণীষী সৃষ্ট দেশের মহাপুরুষগণের প্রতি অবজ্ঞা, উপেক্ষা, অপমান, বিদ্রূপ করার মধ্যে দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে কৃতিত্ব অর্জন করার তালে রয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি কথা উল্লেখ করা যায়। এদের মতে নেতাজী ছিলেন তোজের কুকুর, বিশ্বাসঘাতক। রবীন্দ্রনাথ বুর্জোয়া কবি, বড়লোকের কবি, রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠ নিষিদ্ধ করা প্রয়োজন। রামকৃষ্ণ মৃগী রোগী। বিবেকানন্দ বেকার যুবক, চাকরি না পেয়ে সাধু হয়েছেন ইত্যাদি। এসবের পেছনে রয়েছে সুনিয়োজিত চক্রান্ত করার অভিযোগ, যার উদ্দেশ্য দেশের মানুষকে বিভ্রান্ত করা। রসাতলে যাক ধর্ম, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশ, জাতি, সমাজ। তা করতে গিয়ে এরা 'ইতিহাস কংগ্রেস', 'বিজ্ঞান কংগ্রেস' নামক সংস্থা-সহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি সংস্থাকে ব্যবহার করেছে বছরের পর বছর। সেখান থেকেই বিকৃত-অসত্য বিষয়কে ইতিহাস বলে লেখার ও পাড়ানোর অনুমতি আদায় করে সত্য লুকোবার ব্যবস্থা করেছেন। শিল্প, সাহিত্য, গল্প, উপন্যাস, নাটকের মধ্যে বিকৃতকামী চরিত্র সৃষ্টি করে মানুষকে বিপথে পরিচালিত করেছে। শিল্পের স্বাধীনতা ও বাক্‌স্বাধীনতার নাম করে কদর্যতা ও স্বেচ্ছাচারিতা, যৌনতার সুড়সুড়ি, বিশেষত নারী জাতিকে পণ্য হিসেবে তুলে ধরে বিজ্ঞাপনে-ব্যবসার সুবন্দোবস্ত করা, শিশুশ্রম আইনের ফাঁকে শিশুদের নিয়ে বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপন বানিয়ে এরা প্রমাণ করেছেন— যা বলা হবে তা করা হবে না— যা করা হবে তা বলা হবে না। বিপ্লবী, প্রতিবাদী, বিদ্বজ্জনরা— এসব দেখেন। এবং উপভোগ করেন মাত্র। তার উপর কিছু কিছু ঘটনা তো লজ্জার মাথা খেয়েও প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছেন এইসব বুদ্ধিজীবীর দল। মা-সরস্বতীর নগ্ন চিত্র আঁকা, প্রকাশ্য রাজপথে গোমাংস ভক্ষণের প্রতিযোগিতা, দেব-দেবী নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ কুৎসিত রূপে পরিবেশনের মধ্যে দিয়ে নিজেদের যতই প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবতাবাদী প্রমাণের চেষ্টা হোক না কেন, আসলে তা রঙ্গমঞ্চের নট-নটী ছাড়া আর কিছু নয়। 'মুখে রং মেখে আর মুখোশ পরে পরি যে পরচুলা/আমরা যা নয় তাই সেজে দিই সবার চোখে ধুলা।' তা না হলে সলমন রুশদি রচিত 'স্যাটেনিক ভার্সেস', তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা', 'মেয়েবেলা'-সহ বহু গ্রন্থের বিরুদ্ধে ফতোয়া জারি হতো না।

একটা ট্রাডিশন এদেশে প্রচলিত যে, হিন্দু ও ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে কুৎসা, বাপান্ত, মিথ্যাচার করতে পারলেই এদেশে মহান বুদ্ধিজীবীর তকমা পাওয়া যায় এবং নানা পুরস্কারে ভূষিত হওয়া যায়।

অন্যদিকে, এঁদের বুকের পাটা নেই অন্য কোনো ধর্ম-সংস্কৃতির কাউকে নিয়ে এমনটা করার। সাহস নেই প্রকাশ্য রাজপথে শূকরের মাংস ভক্ষণের প্রতিযোগিতা করার। ৭০ বছরের বৃদ্ধা মুসলমান রমণী শাহবানু সুপ্রিম কোর্ট থেকে যে অধিকার পেয়েও বঞ্চিত হলো ১৯৮৬ খ্রিস্টাব্দে তার বিরুদ্ধে একটি কথাও এদের মুখ থেকে বেরোল না। কোনো মোমবাতি মিছিল, প্রতিবাদ অবস্থান, পদক প্রত্যাখ্যান দেখা গেলো না তথাকথিত বুদ্ধিজীবী নামক ইয়েদের কাছ থেকে। কারণটা সকলেই জানি। এঁর সকলেই নিজেদের দিব্যজ্ঞানী পণ্ডিত বলে মনে করেন এবং অন্যদের গাধা-ঘোড়া ভাবেন। কিন্তু তারা জানেন না যে তাঁরাই আসলে কাণ্ডজ্ঞানহীন। তা না হলে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, সনাতন সভ্যতা, সংস্কৃতি— যা সমগ্র মানব জাতির কাছে শ্রেষ্ঠ বলে স্বীকৃত, তাকে অস্বীকার করার স্পর্ধা দেখাত না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, কবি ইকবাল, বিবেকানন্দ স্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস, সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, এপিজে আব্দুল কালাম, কাজী নজরুল-সহ হাজার হাজার মানুষ এসব উপলব্ধি করে তদের সাধনা করে গেছেন। অনুরোধ জানাই এঁদের সম্পর্কে ভালোভাবে অধ্যয়ন করার চেষ্টা করলে আপনাদের জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ হতে পারে।

নেতিবাচক ধারণা নিয়ে জন্মানো এইসব বুদ্ধিজীবী, কীভাবে সমাজে বিকৃত মানসিকতার ব্যবসা করেছেন, তার কিছু উদাহরণ না দিলে তাদের মানসিকতা বোঝা যাবে না। বুদ্ধদেব বসু বিখ্যাত কবি। তিনি রাতভর বৃষ্টি', 'সাড়া' প্রভৃতি লিখে আদালতে অভিযুক্ত হয়েছিলেন। অন্নদাশংকর রায় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে যুগান্তর পত্রিকায় 'প্লেগ' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে হিন্দুত্বের বিরোধিতা করলেন। কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস নামক রাজনৈতিক সংগঠনের ষড়যন্ত্রের ভয়াবহতার কথা। তিনি আরো লিখলেন--- 'তেলের শিশি ভাঙলো বলে খুকুর পরে রাগ করো/ তোমরা যেসব ধেড়ে খোকা, বাঙলা ভেঙে ভাগ করো— তার বেলা?' কত বড়ো কথা, কিন্তু এই লেখার মধ্যে

সাধারণ জ্ঞানহীনতারই লক্ষণ খুঁজে পাওয়া যায়। তিনি ভুলে গেলেন, হিন্দু কাফেরদের সঙ্গে থাকা সম্ভব নয় বলেই মুসলমানরা ভারত ভেঙে পাকিস্তান করেছে আর হিন্দুদের নিরাপত্তা দিতেই বাঙলা ভাগ করে পশ্চিমবঙ্গ করা হয়েছে। তিনি বুড়ো খোকা হলেও ইসলামের বাণী জানতে না— 'যতদিন না পৃথিবীতে আল্লার ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হয়, ততদিন পৌত্তলিকদের হত্যা করতে থাকো।' অথবা তিনি শোনেননি সেই স্লোগান— 'কান্‌মে বিড়ি মু-মে পান— হাসকে লিয়ে পাকিস্তান।' 'হাসকে লিয়ে পাকিস্তান— লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্তান।' আমাদের বিশ্বাস তিনি সব জানতেন। তিনি জানতেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী না চেষ্টা করলে আজ পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষে যুক্ত হতো না আর তা না হলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নামক 'অশ্বডিম্ব' নিয়ে চর্চাও হতো না।

আর এক আঁতেল— গৌরকিশোর ঘোষ ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দে 'দেশ' পত্রিকায় লিখেছিলেন--- 'ইউনিভার্সিটি ও কলেজের ক্যান্টিনে ক্যান্টিনে খাদ্য হিসেবে চালু হোক গোমাংস।' ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'প্রেম নেই' নামের উপন্যাস লিখলেন। যার বিষয় হিন্দুরা মুসলমানদের প্রতি প্রেম দেখায় না। কিন্তু তিনি কটা গল্প-উপন্যাস লিখেছেন যেখানে মুসলমান সমাজের প্রকৃত সত্য ফুটে উঠেছে? এদের চরিত্র আরো প্রকাশ্যে এল কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতো কট্টরপন্থী মার্কসবাদী সাহিত্যস্রষ্টার অবস্থানে। সম্পূর্ণ বিপরীত ধারার রাজনৈতিক দলে যোগদান করে মার্কসবাদের আদ্যশ্রাদ্ধ করার মহান কৃতিত্বের পর 'জ্ঞানপীঠ' পুরস্কারে ভূষিত হবার মধ্যে দিয়ে। আবার তাঁকে 'বিশ্বভারতী' বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেওয়া হলো কোন বুদ্ধিজীবীদের সুপারিশ অনুসারে? বিশেষ করে যিনি সারাজীবন বিদেশি আদর্শ প্রচার ও দেশীয় ধারার বিরোধী। ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দে নন্দগোপাল সেনগুপ্ত নামের আর এক পরজীবীর এমন একটি নিম্নমানের লেখা রবীন্দ্র পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল, যা দেখে ঘোড়াও হাসতে শুরু করেছিল। বইটির লেখাটির নাম— 'বস্তুবাদীর ভারত জিজ্ঞাসা'। এর প্রতিপাদ্য বিষয় দুটি। প্রথমত, কুৎসিত ভাষায় গালাগালি দিয়ে ভারতীয় মুনি-ঋষিগণের চরিত্র হনন ও 'হিন্দুত্ব' বিষয়কে আক্রমণ, দ্বিতীয়ত, ইসলাম শ্রেষ্ঠ ধর্ম ইত্যাদি। তখন যদি রবীন্দ্রনাথ বেঁচে থাকতেন তবে আমি নিশ্চিত তিনি আত্মহত্যা করে ফেলতেন। পাগলা গারদেও এমনটা হয় না...। আসলে একটা ট্রাডিশন এদেশে প্রচলিত যে, হিন্দু ও ভারতীয়ত্ব সম্পর্কে কুৎসা, বাপান্ত,মিথ্যাচার করতে পারলেই

আসলে হিন্দুত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করতে গিয়ে, হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করতে এবং অন্যদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করতে গিয়ে এইসব মূর্খের দল (পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসকার, সাহিত্যিক, কবি, চিত্র নির্মাতা, চিত্র শিল্পী) ভুলেই গিয়েছিলেন— ধর্ম কখনও নিরপেক্ষ হতে পারে না, যার যার ধর্ম সে তা পালন করবে। কিন্তু দেশ জাতি সমাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমরা এক। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা হয় না, যেমন হয়না সোনার পাথরবাটি, অমাবস্যার চাঁদ।

এদেশে মহান বুদ্ধিজীবীর তকমা পাওয়া যেত এবং নানা পুরস্কারে ভূষিত হওয়া যেত। কিন্তু পূর্বেই বলেছি সময় পাল্টাতে শুরু করেছে, এখন আর সে পথে যওয়া যাবে না। এমন বিপদ সংকেত পেয়েই আজ এদেশে 'কং-বাং-সং-আং' একত্রিত হয়েছে সব পাপাচার ধামাচাপা দিতে। তাইতো দিকে দিকে সাধু হত্যা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা। ওদিকে আবার নতুন নতুন সংবাদ, আইন প্রকাশ্যে আসাতেও তাদের মাথার ব্যামো দেখা দিয়েছে।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়— ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে লিখেছিলেন— 'তিন জোড়া লাথির ঘায়ে— রবীন্দ্র রচনাবলী পাপোশে লুটায়।' এছাড়া তাঁর এক গল্পে-উপন্যাসে পাওয়া গেল 'বালক বয়সে মায়ের মৃত্যুর পর ছোটো মাসির বুকে মুখ লুকিয়ে আমি যখন কেঁদে ছিলাম, সেদিন আমি প্রথম যৌন আনন্দ অনুভব করি।' এ কেমন সাহিত্য সৃষ্টি! যেখানে মৃত্যু, সেখানে যৌনসুখ অনুভব করা যায়? সুনীলবাবুর 'ধুলিবসন' 'রাধাকৃষ্ণ' প্রভৃতি লেখায় বিকৃতকামী মানসিকতার ছবি ফুটে উঠেছে! কথায় বলে— 'যার মন যেমন তার কৃষ্ণ তেমন।' এরা সাহিত্যিক নামেরও কলঙ্ক। 'স-হৃদয়-তত্ত্ব' হলো সাহিত্য, কিন্তু সমাজে অসুস্থতা সৃষ্টি, মানবিক মূল্যবোধের প্রতি আঘাত আর যাই হোক সাহিত্য হতে পারে না। তাইতো রবীন্দ্রনাথ বললেন, 'সাহিত্যের আনন্দের ভোজে, নিজে যা পারিনি দিতে, নিত্য আমি থাকি তারি খোঁজে/ ...সেটা সত্য হোক, শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ/ সত্য মূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি/ ভালো নয় ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরি। তাঁর আর এক কলঙ্কিত উদাহরণ— 'কালী হচ্ছে বিকৃত, বীভৎস, ভীষণদর্শনা সাঁওতাল মাগী।' হিন্দুদের এক আরাধ্যা দেবী সম্পর্কে এমনটা বলে পার পাওয়া যায়, কিন্তু কোনো অন্য ধর্মাবলম্বীদের সম্পর্কে এমন বিকৃতি করার স্পর্ধা কোনো সাহিত্যিকের পূর্বপুরুষেরও নেই। অন্য ধর্মে বহু বিকৃতির কথা আমরা সবাই জানি, কিন্তু বাক্‌স্বাধীনতা, শিল্পের স্বাধীনতা জীবনমুখী শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টির নায়কেরা কেন তসলিমা নাসরিন, সলমন রুশদির বিষয়ে নীরব। কোনো চিত্র শিল্পী উলঙ্গ ছবি আঁকুন, অন্য ধর্মের কারো কৌতুক নকসা, যাত্রা, নাটক, গল্প-উপন্যাস লিখুন তাদের আরাধ্য কাউকে নিয়ে। আমরা জানি আপনাদের অবস্থান, বুকের পটা, চারিত্রিক দৃঢ়তা। প্রসঙ্গত, বলে রাখি, আমরা, ভারতীয়রা হিন্দু সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক বাহকেরা

কাউকে অসম্মান, অবজ্ঞা করার পক্ষপাতী নই। তাই আমরা বিশ্বাস করি— 'শৃণ্বন্তুঃ বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।' ঋষি অরবিন্দ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল আমাদের আদর্শ। তাই এখনও সময় আছে— ভাবুন।

আর এক স্বঘোষিত পণ্ডিত অতুল সুর— 'ভারতের বিবাহের ইতিহাস' নামের একটি বই লিখেছেন। তাতে বলেছেন— 'বঙ্গদেশের কুলীন ব্রাহ্মণেরা বস্তা বেঁধে বিয়ে করতেন, একজন দুশো থেকে তিনশো পর্যন্ত বিবাহ করেছেন।' তিনি জানতেনই না এই হিন্দু সমাজের কত শতাংশ ব্রাহ্মণ এবং সেই ব্রাহ্মণদের কত শতাংশ কুলীন। প্রগতিশীল হিন্দু সমাজে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এসব পরিবর্তন হয়ে অভিশাল মুক্ত হতে পেরেছে— রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে বহু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও সমাজকর্মীর হাত ধরে। অন্যদিকে যে সামাজিক কুপ্রথা চৌদ্দশো বছর ধর্মের দোহাই দিয়ে চালানো হচ্ছে— তার বেলা তিনি কি কিছু বলেছেন বা লিখেছেন? তালাক, (যা ২০২০-তে আইন করে বাতিল হয়েছে) হালাল, বহুবিবাহ, শত শত সন্তান উৎপাদন আল্লার দান বলে এদেশে চলছে। পৃথিবীর বহু দেশ এসব নিষিদ্ধ করেছে, কিন্তু ভরত তার থেকে ব্যতিক্রম। মোগল যুগেও দেখা গেছে, হারেমে শত শত বিবি, ৮০ বছরের বৃদ্ধ দশ বছর বয়সী বালিকাকে নিকা/সাদি করে ধর্মের দোহাই দিয়েছে। সে বিষয়ে অতুলবাবুর মতো কোনো সমাজ বিপ্লবীর কলমের কালি বেরোয় না। মহাশ্বেতা দেবী, বীরেন মিত্র-সহ অসংখ্য বুদ্ধি বিক্রি করে জীবিকা অর্জন করা বুদ্ধিজীবীর দল হিন্দুদের ফেলে আসা সব কুসংস্কার নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, হিন্দুত্বের যে প্রবহমানতা তা দেখতে পান না চোখে ছানি পড়ার জন্য। অতুলবাবুর আর একটি বই— 'হিন্দু দেবদেবীর যৌন জীবন'। গ্রন্থের ভূমিকাতে লিখলেন 'দেবতারা অস্তিত্বহীন'— খুব ভালো কথা, দেবতার অস্তিত্ব আপনি নাও মানতে পারেন, কেউ তাতে মাথার দিব্যি দেয়নি। আপনার মতটা যদি মেনেও নিই (যদিও ছাগলেও তা মানবে বলে মনে হয় না) তবে তো আপনাকে প্রথমেই রাঁচীর পাগলাগারদে পাঠাতে হতো। কারণ অস্তিত্বহীন দেবতাদের কী যৌনজীবন, যৌনাঙ্গ নিয়ে এত বর্ণনার প্রয়োজন ?

আসলে হিন্দুত্বকে হেয় প্রতিপন্ন করতে গিয়ে, হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রমাণ করতে এবং অন্যদের ধর্মনিরপেক্ষ প্রমাণ করতে গিয়ে এইসব মূর্খের দল (পণ্ডিত, বুদ্ধিজীবী, ইতিহাসকার, সাহিত্যিক, কবি, চিত্র নির্মাতা, চিত্র শিল্পী) ভুলেই গিয়েছিলেন— ধর্ম কখনও নিরপেক্ষ হতে পারে না, যার যার ধর্ম সে তা পালন করবে। কিন্তু দেশ জাতি সমাজ রাষ্ট্র ব্যবস্থায় আমরা এক। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা হয় না, যেমন হয়না সোনার পাথরবাটি, অমাবস্যার চাঁদ। আর ধর্ম শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ— ধৃ ধাতু থেকে উদ্ধৃত ধারণ অর্থাৎ গ্রহণ। সমাজ বা ব্যক্তি মঙ্গলের জন্য যা কিছু ধারণ বা গ্রহণ করবে তই ধর্ম। যা কিছু ধারণ বা গ্রহণ করলে অমঙ্গল বা ক্ষতি হবে তাই-ই অধর্ম। একটা উদাহরণ : 'আগুনের ধর্ম দহন করা, সেই দহন— রন্ধন, শীতনিবারণ ইত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হলে হবে ধর্ম, কিন্তু তা কাউকে অগ্নিদগ্ধ করতে কিংবা নষ্ট করতে ব্যবহারের নাম অধর্ম।' তাই হিন্দু সমাজ যুগে যুগে বহু কিছু প্রয়োজনে গ্রহণও করেছে, আবার অপ্রয়োজনে বর্জনও করেছে। যেমন করোনার প্রয়োজনে আমাদের বেশ কিছু নিয়মের সঙ্গে মুখে মাস্ক পরা আজ বাধ্যতামূলক হয়েছে।

অক্সফোর্ডের বিতর্কিত মানুষ নীরদ সি. চৌধুরী লিখেছিলেন— 'জাতীয় জীবনের উত্থান ও গৌরবের জন্য যোগ্য নেতৃত্বের যেমন দরকার, তেমনি দরকার হয় ধ্বংস ও পচনের জন্য।' বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত— 'তারিক আলি'— 'Can Pakisthan Servive' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন— '১৯০৬ সালে 'জামাতে উলামায়ে হিন্দ'-এর নেতা বলেছিলেন— ভারতে হিন্দু নেতা ও বিদ্বানদের যা অবস্থা, তাতে ওরাই ওটাকে মুসলমান রাষ্ট্র বানিয়ে দেবে। আমাদের বিশেষ চেষ্টা না করলেও হবে।' সকলেই বুঝল, শুধু বুঝল না আমাদের আঁতেল গোষ্ঠী। নেহাত ভারতবর্ষ বহু হাজার বছরের শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছে বলেই এত বছরের বিদেশি শাসন আক্রমণ, দেশের ভেতরের জয়চাঁদ বিদ্বানদের বিশ্বাসঘাতকতা সত্ত্বেও স্বমহিমায় বিরাজমান। ▯

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।

মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

বচন রক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে জীবনে অনেক উন্নতি সম্ভব

স্বামী বিষ্ণুপদানন্দ

শব্দ ও বাক্য আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চলার পথে নিত্য সঙ্গী, বন্ধু, সুখ-দুঃখের সঙ্গে জড়িত। অন্তরের ভাষার প্রকাশক, টক, ঝাল, মিষ্টি, তিতো খাদ্যের স্বাদের মতো অনুভূতি প্রদান করে। শব্দ থেকেই হয় বাক্যের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণকে বাদ দিয়েও পূর্ণ আগ্রহে বলা যায় শব্দের গতি ও শক্তি অপরিসীম। শব্দ আমাদের অন্তরে দুঃখ, বেদনা, আনন্দ, সুখ, ক্রোধ, বিতৃষ্ণা ইত্যাদি সৃষ্টি করে। আমাদের হৃদ-যন্ত্রের সঙ্গে যেন ইঞ্জিনের মতো জড়িয়ে আছে শব্দ। একই শব্দের উচ্চারণের সঙ্গে রয়েছে কত রকম ভাবের স্ফুরণ। যে শব্দটা মিষ্টি করে বললে মানুষের হৃদয়ে এক আনন্দের উচ্ছ্বাস প্রবাহিত হয় ঠিক সেই একই শব্দটা ব্যঙ্গ করে বা মুখ ভেংচিয়ে বললে বিরক্তি, বেদনা, অশোভন ক্রোধের উৎপন্ন হয়, মানুষের হৃদয়টা তেলের উপর ভাজা অবস্থায় বেগুনের মতো টগবগ করে জ্বলতে থাকে। শব্দ আমাদের চিরন্তন অনুভূতির পরশে ওতপ্রোতভাবে বিরাজ করছে। যারা যত বেশি আবেগপ্রবণ তাদের অন্তরকে যে কোনো শব্দ তত অধিক দ্রুতশীল গতিতে আকর্ষণ করে। আবার এমনও দেখা যায় গলার স্বরের সঙ্গেও মানুষের অন্তর আকর্ষণের শক্তি মিশ্রিত আছে। যার গলার শব্দ কর্কশ বা অমিষ্ট তারা যতই শান্ত মধুর ভাবে বলুক না কেন — মন আকর্ষণ করে না ও বিরোধী ভাবও উৎপন্ন হয় না। সুকণ্ঠী গায়ক-গায়িকা এর প্রমাণ। সুন্দর সুরেলা কণ্ঠে গাইলে যেমন আমাদের হৃদয় ভরে ওঠে, মনে এক তৃপ্তি অনুভব হয় সুরহীন কণ্ঠে গাইলে তেমন হয় না। তবে অন্তরের ভালোবাসার আকর্ষণ থাকলে যা কিছু করুন না কেন অতৃপ্তিকর মনে হয় না। কারণ ভালোবাসার এক মহৎ শক্তি আছে। তবে অপ্রীতিকর কর্ম ভালোবাসার বিপরীত স্থিতি, অমর্যাদাজনক

অন্তঃকরণ। যার কণ্ঠের গুণ নেই তার ব্যবহারিক গুণগুলি এক মহত্ত্বের পরিভাষা বহন করে। সমাজের পাশাপাশি বসবাসকারী যত পক্ষী আছে তাদের মধ্যে কাক সবচেয়ে অসুন্দর। তার কণ্ঠস্বর যেমন কর্কশ তেমনি ব্যবহারও খারাপ, যত প্রকার নোংরা খাবারে অভ্যস্ত। কিন্তু এদের মধ্যে অসীম মহৎ গুণও আছে। এরা অত্যন্ত সাংগঠনিক পাখী। তাছাড়াও এদের কণ্ঠের উচ্চারণের মধ্য দিয়ে অনেক প্রকার ভবিষ্যৎ বাণী পাওয়া যায়, জ্যোতিষ শাস্ত্রবিদ এবং সাধকরা প্রচার করেছেন। তেমনি এই জগতে এমন কোনো মানুষ নেই যার কোনো গুণ নেই। হয়তো গুণের পরিমাণ খুব সীমিত কিন্তু সুপ্ত অবস্থায় থাকলেও আছে। তাই আমাদের কর্তব্য খারাপটুকুকে গ্রহণ করতে না পারি, মর্যাদা দিতে না পারলে ভালো সদ্‌গুণটাকে মর্যাদা দেওয়া অমর্যাদাজনক নয়, এটা মানবতার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। তবে শুধু মিষ্টি কথা বললে তাকে বিশ্বাস করা যায় এমন নয়। অত্যন্ত চতুর, স্বার্থবাদী, দুর্বৃত্ত মানুষ তারা মিষ্টি ভাষা ব্যবহার করে তাদের স্বার্থ উদ্ধার করে সরে পড়ে। এমন মানুষের সদ্ব্যবহারও মনে বিতৃষ্ণার সৃষ্টি করে থাকে, অন্তরে অশান্তিপূর্ণ অতৃপ্তির চাপা ঝড় উৎপন্ন হয়।

আমাদের মুখের বচনের অন্তর্মুখী ভাব ও বহির্মুখী ভাব ভিন্ন প্রকার হতে পারে তবুও ভাষা, ব্যবহার, পরিস্থিতির অনুভবে মুখের ভঙ্গীর পরিবর্তন হয়। ছল কপট অভিনয়কারী দীর্ঘদিনের পরিচিত মানুষের উপর সন্দেহ তো আসেই। শুধু ভাষা ও ব্যবহারের উপর জগৎ চলে না, কর্মের প্রদর্শনও বিবেচিত। আবার দেখা যায় দুষ্ট লোকের মিষ্টি কথায় মানুষ বিরক্ত হয়। মুখে না বললেও অন্তরে বিচ্ছেদ ভাবের পরশ বুলিয়ে দেয়। মানুষের মনের উপর সন্দেহের পরশ মিশিয়ে দেওয়ার কৌশল এক ভেজাল উপকরণ। ভেজাল বস্তুর বিক্রেতা ও প্রস্তুতকারকরা যেমন অপরাধী তেমনি মনের উপর ভেজালের আবরণ ঢেলে দেওয়া মানুষও সমান অপরাধী। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে শুধু মিষ্টি কথা মধুর শব্দ বা ভাষার চেয়ে নিষ্কপট সহজ সরল স্বাভাবিক সর্বদা প্রচলিত ভাষা ও ব্যবহার আদর্শের উচ্চতা রক্ষা করে। পরিস্থিতির স্বাভাবিক ভারসাম্য বজায় রাখে। বার বার চতুর ব্যবহারে মানুষের অন্তরে এক অবিশ্বাস ও স্বার্থান্বেষী ভাবের আস্তরণের পর্দায় ঢাকা পড়ে যায়। যদি এই রকম অবস্থাকে আমরা দোষ না দিই তবে নিজেরা অদৃশ্য অপরাধীর স্তরে উপনীত হবো। অন্তর্মুখী ভাবকে জাগ্রত রাখতে এবং রক্ষা করতে হলে অনেক সময় পরিস্থিতিকে এড়িয়ে চলবার প্রয়োজন হয়। উপহাস মিশ্রিত মিষ্টি ভাষার শব্দ কি মানুষকে কখনও তৃপ্তি দান করতে পারে? ব্যাঙ্গাত্মক বা ছলনাজনক মিষ্টি ভাষা মানুষের অন্তরকে বিষাক্ত করে দেয়, শান্তির বদলে অশান্তি সৃষ্টি করে।

যখন কারও প্রতি ক্রোধ করতে ইচ্ছা করে না, বিরোধ করতে মন চায় না, কারও অপ্রয়োজনীয় সমালোচনায় যোগ দিতে আকাঙ্ক্ষা জাগে না, অন্তরের এমন অবস্থায় বিকৃত আড্ডায় অংশগ্রহণ করতেও আশা জাগে না— এটা অপরাধ নয় , নিজের অন্তর্নিহিত ভাবকে বজায় রাখার এক পদ্ধতি। এতে যদি

কেউ দোষ বা অমর্যাদাজনক কিছু ভাবে তবে তার সংস্পর্শ এড়িয়ে চলাই ভালো। কারও কর্মে সহযোগিতা করা পাপ নয়, দোষ নয় কিন্তু তার আলোচনার মধ্যে যদি বিরক্তিজনক শব্দ থাকে তবে সহযোগিতার মনও বিরক্তিতে ভরে ওঠে। যারা কর্তৃত্বের অহংকারে সর্বদা নিজেকে মহাজ্ঞানী মনে করে তাদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে কর্ম করা বা সহযোগিতা করা অশান্তিকর ও বিবক্তিজনক। অপ্রয়োজনীয় সমালোচনা থেকে দূরে থাকলে নিজের মনের ভারসাম্য রক্ষা করা সহজ হয়। দুষ্ট ব্যক্তিরা সমালোচনার স্বাভাবিক শব্দ নিয়ে তালকে তিল করে থাকে এমন লোকের নিকট হতে নিজেকে দূরে রাখা বা তার সংস্পর্শ পরিত্যাগ করা অভদ্রতা বলা যায় না, অমানবতাও নয়। যারা ভগবৎপ্রেমিক হতে চেষ্টা করে, মহৎ হবার জন্য ভাবকে আয়ত্ত করতে সাধনা করে, আদর্শকে ধরে রাখবার জন্য নিজেকে তৈরি করতে চায় তারা সর্বদা অমর্যাদাজনক শব্দ ব্যবহারকারীর প্রহসন থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চায় । অন্তর্দগ্ধজনক সমালোচনায় যোগ দিতে এমন ব্যক্তিরা চায় না। মানুষের সদ্‌গুণকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রবৃত্তি, পশ্চাৎ থেকে বিরোধ মনোভাব মনুষ্যত্বের আওতায় পড়ে না, ভদ্রতার উপকরণ নয়, শিক্ষার মর্যাদা রক্ষা করে না। কাউকে অন্যায় ভাবে অপ্রয়োজনে বিরক্ত করে বিষাক্ত করার পর নিজের মনে যদি অনুতাপ হয়, নিজের অপব্যবহারের পাপ মোচনের ভাব জাগে তবে তার বিষাক্ত মনকে শান্ত করতে নিষ্কপট মন নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সদ্ব্যবহার করবার প্রয়োজন যতদিন না তার মনে বিরক্তির প্রলেপ মুছে না যায়। সর্বদা হাসি, ঠাট্টা, তামাশা, মশকরা সবার পক্ষে মর্যাদাজনক নয়। ব্যক্তিত্ব এবং সম্পর্কের মধ্যে পার্থক্য থাকে। সেগুলিকে লক্ষ্য রাখবার প্রয়োজনই সদ্‌বুদ্ধি। নির্মল ভাবের ভক্তদের নিকট হতেও সাধকরা সদ্‌গুণ আহরণ করে নিজের জীবনে ব্যবহার করবার চেষ্টা করে থাকে। এই নির্মল গুণের মানুষই প্রকৃত ভক্ত।

আমাদের অন্তরের পরিধি অনেক বিশাল। তার মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক ভাবের মণিমুক্তা, আদর্শের মহত্ত্ব, উচ্চাকাঙ্ক্ষার ঐশ্বর্য। তাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন অনুশীলন ও প্রচেষ্টা। সব সময় অপরের সহানুভূতির উপর নির্ভর করলে নিজের আত্মশক্তির প্রসারতা কমে যায়, তাই নিজের মনের সহানুভূতির উপর আস্থা রেখে, বিশ্বাস উৎপাদন করে কর্মের সাধনা করে যেতে হয়। মহৎ কর্মে লোককল্যাণের জন্য বাধাবিঘ্ন এসে থাকে কিন্তু তার স্রোতে নিজের মনকে ভাসিয়ে দিলে কোনো শুভ কর্ম সফল করা যায় না। তেমনি ভাষা, বাক্য ও শব্দের শক্তির সফলতার জন্য প্রয়োজন মানসিক শক্তির তীব্রতা। উদ্দেশ্যহীন জীবন প্রবাহ পশুর সমান তাই মানব জীবনের প্রতি পাতায় পাতায় থাকবে উদ্দেশ্য, আশা-আকাঙ্ক্ষার গতি, এর জন্য কখনও প্রয়োজন হতে পারে জ্ঞানী নম্র ভদ্র সহানুভূতিশীল মানুষের সহযোগিতা। সর্বদা বিরোধী সমালোচকের সংস্পর্শ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে না রাখলে নিজের মনে আসে দুর্বলতা, জড়তা। এতে উদ্যম ও উৎসাহ স্তিমিত হবার সম্ভাবনাও যথেষ্ট থাকে। নিজের ক্ষমতায় যা সম্ভব তাকে নিজের আত্মজ্ঞানে রূপ দিতে চেষ্টা করা উত্তম কর্তব্য। সর্বদা যারা কথায় কথায় বা সুকৌশলে অথবা সরাসরি মানসিক কষ্ট উদ্রেককারী শব্দ উল্লেখ করতে প্রয়াসী হয় তেমন নরাধম দুর্বৃত্ত মনোভাবের মানুষের থেকে দূরে থাকা শক্তির প্রথা নির্দেশ করে।

বিনম্রতা সাধনার এক বিশেষ গুণ যা ভক্তি ও শ্রদ্ধার উপকরণ। এই গুণটি মানুষের ভাষাকে সংযত রাখে, শব্দ ও বাক্যকে মর্যাদাজনক রূপে প্রকাশ করে, ধৈর্য শক্তিকে বিকশিত করে, উত্তপ্ত হৃদয়কে শান্ত রাখতে সহযোগিতা করে, ব্যবহারিক ভদ্রতাকে মধুরতার পরিপূর্ণ করে, নম্রতার পরশ মানুষের অন্তরকে নির্মল শুদ্ধ পবিত্র সৌন্দর্যের মাধুর্যে ভাবময় করে তোলে, কণ্ঠস্বরকে আয়ত্তে রাখে, মানসিক শান্তি প্রদান করে। এটা শুধু সাংসারিক বাস্তব জীবনের পাথেয় নয় , সাধনার পথেও এক মহাসম্বল। বার বার খারাপ ব্যবহার ধৈর্যশীল সাধককেও এক সময় অস্থির করে তোলে। এরূপ ধৃষ্টতাকে দমন করতে হলে হৃদয়ে নম্রতারূপ ঐশ্বর্যের স্থাপনা করতে হয় । তাহলে মহত্ত্বের সম্বলটুকু ধরে রাখা সরল হয়। সদগুণাবলীর সাধকরাও বারংবার হয়রানির জন্য ফোস করতে বাধ্য হয়, কিন্তু সেটা অন্তর. থেকে নয়। আধ্যাত্মিক পথে বাকসংযম এক মহা সাধনা। সাধকরা সেই চেষ্টাই করে থাকেন। এতে অন্তরে আত্মিক ভাবের সৃষ্টি করতে সহযোগিতা করে। সব সময় খেতে, বসতে, শুতে বকবক করা সাধকদের পক্ষে মনঃসংযমের বিঘ্ন উৎপন্ন করে। তাই অপ্রয়োজনীয় পরিস্থিতিকে একটু দূরে সরিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় অমঙ্গলজনক ভাষা প্রয়োগ উচিত নয়। এটাই আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহকে অব্যাহত রাখার এক নীরব পন্থা।

মানব জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে, পলে পলে, স্তরে স্তরে, আশায়, আকাঙ্ক্ষায়, প্রতি কর্মে, চলার পথে বচন রক্ষা করাও এক শুদ্ধ সাধনা। কারও একটা কথার উপর বিশ্বাস করে যদি কেউ অপেক্ষা করতে থাকে, নির্ভর করে বসে থাকে তখন যদি সে কথা রক্ষা না করে না আসে তবে এর চেয়ে অপরাধ আধ্যাত্মিক জগতে বিরল। বজরঙ্গবলী সিরিয়ালে দেখলাম, হনুমান বচন রক্ষার জন্য তার জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত হয়েছে। আমরা জীবন দিতে না পারি কিন্তু কথা দিয়ে রক্ষা করতে না পারলে সময় থাকতে জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, যেন যাকে কথা দেওয়া হয়েছে তার কোনো ক্ষতি না হয় বা আশা করে বসে না থাকে। আশা দিয়ে দুরাশার অগ্নিতে দগ্ধ করা, বচন রক্ষায় চরম অবহেলা মানবতার মধ্যে পড়ে না। বাক্য ও কর্ম দ্বারা মানুষের মনুষ্যত্বের বিচার করা যায়। শুধু ভগবানের মন্দিরে রাশি রাশি দুধ ঘি ফুল বেলপাতা নিক্ষেপ করলে, মাথা ঠুকলে ধর্মের ধ্বজাতলে ধর্মিক হওয়া যায় না, ভক্ত হওয়া যায় না। মানুষ যতই সামান্য হোক তাকে কথা দিয়ে রক্ষা না করলে, অবহেলা করলে মানবতার কলঙ্ক ছাড়া আর কী বলা যায়। ঘণ্টার পর ঘণ্টা মন্দিরে মাথা ঠুকে কী হবে যদি মানুষের সমস্যার জন্য কথা দিয়ে কথা না রাখলাম। এটা বচন ও মনুষ্যত্বের দুর্ব্যবহার। রামচন্দ্র পিতার বচন রক্ষা করতে বনবাসে গেলেন। বিধাতার পায়ে মাথা ঠোকার চেয়ে বাস্তব জীবনে কর্ম ও বচনের মহত্ত্বকে রক্ষা করা এক বিরাট সাধনা। আমাদের বচন ও বাক্যের শক্তি মাহাত্ম্যকে জীবনে যদি এতটুকু পালন করতে না পারি তবে মানব জীবনের কী মূল্য থাকলো? কথা রক্ষা করা সম্ভব হলেও যদি অবহেলা করা বা উপেক্ষা করা হয় তবে তেমন পরিস্থিতিতে প্রতিশ্রুতি না দেওয়াই উপযুক্ত, এতে অপেক্ষারত মানুষটি অন্তত বিপরীত চেষ্টা করার সুযোগ পায়। বচন রক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারলে জীবনের অনেক উন্নতি সম্ভবপর আমরা সে কথা পরকালের পাথেয় হিসেবে সঞ্চয় করে রাখতে পারি।

(লেখক দ্বারকা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের সন্ন্যাসী)

করোনা অতিমারীকে সঠিকভাবে মোকাবিলা করছে কেন্দ্র সরকার

শ্রীমতী সুজাতা রাও

আপাত অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে গেলে নেতা সুলভ সাহসের দরকার হয়। এই প্রসঙ্গেই রাজনীতি ও প্রশাসনের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্ন ওঠে। দুটির ক্ষেত্রেই ক্ষমতার প্রসঙ্গ জড়িত। প্রশাসন হচ্ছে সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার আইনসিদ্ধ পথে প্রচলিত কায়দাকানুন মেনে জনহিতে প্রয়োগ করা হয়।

অনেকেই মনে করেন দিল্লির কেজরিওয়াল সরকার চলতি উৎসবের মরসুম ও তার সঙ্গে আবহাওয়ার দূষণের পরিস্থিতির তোয়াক্কা না করেই সমস্ত সামাজিক মেলামেশার পথ খুলে দেওয়ার পরিণতিতেই যেখানে করোনার বৃদ্ধি এমন ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মজার কথা, আপ দলের মুখপত্র এ সম্পর্কে বলেছেন অনেক কিছুকেই বৈজ্ঞানিক ভাবে সঠিক জানলেও রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতার কারণেই নীতি নির্ধারণ যথাযথ ভাবে করা যায় না। বাঃ

দিল্লিতে তাঁরা নাকি মেলামেশা ও অন্যান্য উৎসব পালনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত বিধিনিষেধ আরোপের সময় বিরোধী দল বিজেপি ও কংগ্রেসের তরফে চাপের কারণেই একটা ব্যালেন্স করতে চেয়েছিলেন। এটি এক কথায় ভয়াবহ অভিযোগ। সরকারের প্রাথমিক দয়িত্ব নাগরিকদের জীবনরক্ষা ও তাদের মঙ্গলসাধন করা। দেওয়ালি, ছট পুজোর দাবিকে ঢালাও অনুমোদন দিয়ে সস্তা জনপ্রিয়তা কুড়িয়ে ভবিষ্যতে মানুষের জীবন নিরাপদ না রেখে সরকার টিকিয়ে রাখার আশ্বাস খোঁজা অতি নিন্দনীয়। এই ধরনের আপাত অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিতে গেলে নেতা সুলভ সাহসের দরকার হয়। এই প্রসঙ্গেই রাজনীতি ও প্রশাসনের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রশ্ন ওঠে। দুটির ক্ষেত্রেই ক্ষমতার প্রসঙ্গ জড়িত। প্রশাসন হচ্ছে সেই পদ্ধতি যার মাধ্যমে প্রাপ্ত রাজনৈতিক ক্ষমতার আইনসিদ্ধ পথে প্রচলিত কায়দাকানুন মেনে জনহিতে প্রয়োগ করা হয়। আর অবশ্যই রাজনীতিক ও প্রশাসনের যৌথ দায়বদ্ধতা থেকেই যায়। এই দুটি জিনিস কোভিড অতিমারীর ক্ষেত্রে কীভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে?

সকলেই জানেন দিল্লির বিধানসভায় আপ সরকারের তিন চতুর্থাংশ গরিষ্ঠতা রয়েছে। তবু, এই অতিমারীর সময় তাদের নাকি ধর্মীয় ভাবাবেগকে প্রাধান্য দিতে হলো। তারা উৎসব পালনে উৎসাহীদের সঙ্গে বসে যথাযথ তথ্য ও অতিমারীর সংক্রমণের পরিসংখ্যান ও বাড়তি সংক্রমণের আশঙ্কা নিয়ে কোনো আলোচনা, মত বিনিময়ে গেলেন না। যদি জনপ্রিয়তায় টান পড়ে? একথাও বলতে হবে বিরোধী দলেগুলি বহু সময়ই বিরোধিতার কারণে কিছু অযৌক্তিক দাবি করে। কিন্তু অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে সরকারের এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজ নাগরিকদেরই বৃহত্তর বিপদের দিকে ঠেলে দিল। এমন দায়বদ্ধতাহীন রাজনৈতিক সংস্কৃতিই এখন দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার প্রবণতা নজরে আসছে। আপ সরকার এই বিপজ্জনক কাজ করে তাদের সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছে যারা তাদের ওপর রাজ্য চালানোর অধিকার অর্পণ করেছিল । মানুষের জীবনকে অতিমারীর সময় আরও বিপন্ন করে তোলা অপরাধমূলক কাজ। সংক্রামিতের সংখ্যায় লাগাম ছাড়া বৃদ্ধি ও ফলস্বরূপ হাসপাতাল শয্যার বিপুল চাহিদা সমাগ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপরই তুমুল চাপ সৃষ্টি করেছে। নাগরিকরা সংক্রমিত হয়ে হন্যে হয়ে হাসপাতাল থেকে হাসপাতাল ঘুরে বেড়াচ্ছে। অতিমারী শুরু হওয়ার আট মাস কেটে যাওয়ার পরও এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি হওয়া মেনে নিতে কষ্ট হয়। জানুয়ারি মাস থেকেই কিন্তুই বিপদ সংকেত দিতে শুরু করেছিল। ভারতের একপ্রকার সৌভাগ্যই বলা যায়— কোভিডের বীজাণু এদেশে একটু দেরিতেই থাবা বাসিয়েছে। এপ্রিলে ঢোকার পরও গতি একটু শ্লথ থাকায় মানুষের সেরে ওঠারও কিছুটা সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। হারপাতাল শয্যা সংখ্যায় প্রথমদিকে অনটন হয়নি। কিন্তু

দিল্লির এই সাম্প্রতিক বৃদ্ধি তো শীতের আগমন ও আবহাওয়ায় দূষণের মাত্রা ছাড়ানোর কারণে হতে পারে একথা তো জানাই ছিল। তাহলে এখন অবাক হয়ে যাওয়ার যুক্তি কী?

এর মধ্যে আনলক প্রক্রিয়ায় বহু ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় স্তরের কোনো নির্দিষ্ট নির্দেশিকার অনুসরণ করা হয়নি। দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো থাকায় কোনো কিছু তা যতই জনহিতকর হোক না কেন সংবিধান মোতাবেক কোনটি কার (রাজ্য বা কেন্দ্রের) কতটা আয়ত্তাধীন ইত্যাকার বিরোধাভাস থাকায় অনেকটই রাজ্য সরকারগুলির ইচ্ছাধীন থেকে গেছে। এর ফলে বহু ক্ষেত্রেই জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা যে মত পোষণ করেছেন, রাজনীতি ও জনপ্রিয়তা অটুট রাখার কারণে তার উপযুক্ত প্রয়োগ হয়নি। দায়বদ্ধতাহীন শাসনে নাগরিক জীবনের নিরাপত্তা যে বিঘ্নিত হয় তার প্রমাণ দিল্লির বাড়বৃদ্ধি এবং পরিণতিতে দ্বিতীয় বার কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীর হস্তক্ষেপের দ্বারা পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দেশে positivity rate (করোনা পরীক্ষা করে কতজন সংক্রমিত পাওয়া গেল) যখন ১৩ শতাংশ ছিল সেই সময় বাস্তবে সংক্রমণ পরিসংখ্যানের অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময় পরীক্ষাগারও কম ছিল, ফলে পরীক্ষাও কম হয়েছে। কিন্তু দেশের বহু উচ্ছৃঙ্খল জনগণ ও তাদের সঠিক পথে নিয়ে আসার মতো নিয়ন্ত্রকের অভাবে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে থাকে। নিয়ম না মানা বহু মানুষের চরিত্র-লক্ষণ। কিন্তু সরকারকে স্বচ্ছনীতি নির্ধারণ, নিয়ম, আইন এবং তা ভাঙলে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকলে এদের বাগে আনা মুশকিল হয়। এতদিন পরে মাস্ক না পরলে জরিমানা চালু হয়েছে। এর সঙ্গে ব্যাপক জনসংযোগ ও প্রচারের মাধ্যমে নাগরিকদের সজাগ করে তোলার বিষয়েও খামতি থেকে গেছে। তাদের অভ্যস্ত জীবনে ব্যবহারিক পরিবর্তন আনতে প্রচারের বিশেষ করে মহল্লাভিত্তিক বিশেষ প্রয়োজন ছিল। কিন্তু আমরা কি চেষ্টা করিনি? অবশ্যই হয়েছে। জায়গায় জায়গায় কড়া লকডাউন মানা হয়েছে। মানুষ খুবই কষ্ট করেছে। কিন্তু তারপরই সমস্ত ধাপ এড়িয়ে হুড়মুড় করে রাতারাতি সবকিছু আগের মতো অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া— যেমন, সব গণপরিবহণ, বাজার, প্রার্থনাস্থলগুলি এমন পূর্ণ মাত্রায় দিল্লিতে থাকে বলে রমরম করে চলছে। এটি অপরিণামদর্শিতা ছাড়া আর কী?

অর্থনৈতিক সমস্যা, কর্মহীনতা একবারেই নিষ্ঠুর বাস্তব। ছোটো ব্যবসায়ী, দোকানদাররা ভয়ংকর লোকসানের মুখে পড়েছে। এমন পরিস্থিতিতে দরকার শক্তিশালী প্রাজ্ঞ নেতার যাঁকে দেখা যাবে। যিনি সর্বদা পথ দেখাচ্ছেন, বোঝাচ্ছেন, ঠিক ভুলের পার্থক্য ধরে দিচ্ছেন। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে জনতার সরাসরি অংশগ্রহণমূলক এমন একমধ্যপন্থা অবলম্বন ও সেইপথে চলে অতিমারীর মোকাবিলাই নেতার কাছে কাম্য ছিল। যাতে মানুষ আত্মনিয়ন্ত্রণে নিজেরাই উদ্যোগী হয় অন্যকে বোঝায়। নিজেদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় স্বাস্থকর পদ্ধতি অনুসরণ করে যা প্রকারান্তরে সরকরকেই মহামারী নিয়ন্ত্রণের নিয়মাবলী অনেক সহজেই লাগু করতে সফলতা দিতে পারত।

দিল্লির ক্ষেত্রে গোষ্ঠী সংক্রমণ যে হয়েছে তা গোয়ার্তুমি করে অস্বীকার করা একটা মারাত্মক ভুল। অথচ এর অকাট্য প্রমাণ ছিল। সেই অনুযায়ী দিশা নির্ধারণ করতেই যেখানে বহু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়ে যায়। গোষ্ঠী সংক্রমণের ক্ষেত্রে একমাত্র পথ ছিল প্রথমেই রোগীকে চিহ্নিত করে চিকিৎসা শুরু করা। সঙ্গে সঙ্গে মহল্লায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা— 'সাবধান হন, নিয়মাবলী পালন করুন, ব্যাপক সংক্রমণ শুরু হয়েছে।' বাড়ি বাড়ি স্বাস্থ্যকর্মী ঘুরিয়ে সরকার নিজের দম আগেই ফুরিয়ে ফেলেছিল।

দিল্লির ক্ষেত্রে অন্তত নাগরিকদের অংশগ্রহণ, জনসচেতনতা অভিযান একেবারেই অনুপস্থিত ছিল। অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় এই ধরনের ব্যবস্থা নিতে দিল্লির বাড়তি সুবিধে ছিল। কিন্তু রাজ্য সরকারের তরফে নির্দিষ্ট কোনো পরিকল্পনা নেওয়া হয়নি। 'আজ খোলো ,হঠাৎ কাল বন্ধ কর' এমন একটা ছাড়া ছাড়া মানসিকতা প্রাধান্য পেয়েছে। যে জন্য এই কোভিড অতিমারী ও ব্যাপক জীবনহানি চিরকাল একটা ট্র্যাজেডি হয়েই থেকে যাবে।

অতিমারীর ব্যবস্থাপনায় (Pandemic Management) যেমনটা প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, এটি একটি যুদ্ধ যা লড়তে হবে ও জিততে হবে। কিন্তু সব বিষয়ে আমাদের দলগুলির রাজনৈতিক লাভ ওঠাবার অপচেষ্টা আমাদের অনেক রাজ্য সরকারকেই জনহিতে কাজ করা থেকে পিছিয়ে দিচ্ছে।

মনে রাখতে হবে, প্রতিষেধক টিকা আসতে এখনও বেশ দেরি আছে। কিন্তু অতিমারী থাকবে, আমাদের এর সঙ্গে বাঁচতে হবে। তাই একটি সর্বভারতীয় একেবারে নির্দিষ্ট নীতি নির্ধারণ হোক। রাজ্যে রাজ্যে তা পালন হচ্ছে কিনা তা দেখতে কেন্দ্রীয় পরিদর্শকরা কোথাও রাজনীতিকে প্রাধান্য দিয়ে দেশের মানুষের জীবন বিপন্ন হচ্ছে কিনা তা নিশ্চিত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার সুপারিশ করুক।

(লেখক ভূতপূর্ব স্বাস্থ্য সচিব)

With Best Compliments from -

A Well Wisher

ভণ্ডরা মাজার-মসজিদ ছেড়ে হিন্দুত্বের ভক্ত সাজছেন

মণীন্দ্রনাথ সাহা

দূরদর্শনের খবরে দেখা গেছে রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে ভাইফোঁটা দিচ্ছেন কোনো বোন। ভাইফোঁটা হিন্দু সংস্কৃতি। বারোমাসে তের পার্বণের অঙ্গ এই ভাইফোঁটা। এবং তা বহুল প্রচারিত। পৌরাণিক যুগ থেকেই ভাইফোঁটার প্রচলন। কথিত আছে— যমের বোন যমুনা যমকে ফোঁটা দিয়ে তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করেছিলেন। সেই প্রথা মেনে আজও বঙ্গপ্রদেশের ঘরে ঘরে বোনেরা ভাইকে ফোঁটা দিয়ে ভাইয়ের দীর্ঘজীবন ও মঙ্গল কামনা করে বলেন— 'ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা যম দুয়ারে পড়ল কাঁটা/ যমুনা দেয় যমকে ফোঁটা/ আমি দিই আমার ভাইকে ফোঁটা।'

অন্য কোনো ধর্মের লোক যদি হিন্দু সংস্কৃতি পালন করেন তাতে দোষের কিছু নেই। একজন মানুষ যদি তাঁর নিজের ধর্ম পালন করে অন্য ধর্মের কৃষ্টি-সংস্কৃতি আচরণ করেন তাহলেও তাকে দোষ দেওয়া যায় না। যেমন অনেকেই জানেন যে, সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি এক বৃদ্ধার অনুরোধে তাঁর বাড়িতে গিয়ে সরস্বতী পূজা করে দিয়েছিলেন। আলি সাহেবের সেই নিষ্ঠাভরা পূজা দেখে বৃদ্ধার বাড়ির প্রত্যেকেই খুব খুশি হয়েছিলেন। দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আবুল কালাম ছাত্রাবস্থায় ধর্মগ্রন্থ পাঠকে কুসংস্কার মনে করতেন। কিন্তু বিক্রম সারাভাইকে গীতা পাঠ করতে দেখার পর তাঁর মতের পরিবর্তন হয় এবং তারপর আজীবন তিনি গীতা পাঠ করে গেছেন। আরও জানা যায় গীতাপাঠ শুরু করার পর থেকে তিনি মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। কাজি নজরুল ইসলাম তো হিন্দুদের দেবীকে উদ্দেশ্য করে বহু কবিতা রচনা করে গেছেন এবং হিন্দু সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখেছেন এবং বর্ণনা করেছেন। তার জন্য গোঁড়া মুসলমানরা নজরুল ইসলাম, আলি সাহেব এবং কালাম সাহেবকে সাচ্চা মুসলমান বলে মনে করতো না। তাই ফিরহাদ হাকিমের কোনো এক বোনের হাতে ফোঁটা নেওয়া দোষের না হলেও মানুষের মনে কিছু প্রশ্নের সৃষ্টি করেছে। দীর্ঘদিন ধরে আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের হিন্দু নেতাদের ভোটের আগে পির-ফকিরের আস্তানায় গিয়ে দোয়া মাঙতে দেখেছি, মসজিদ-মাজারে চাদর চড়াতে দেখেছি। হঠাৎ কী এমন ঘটনা ঘটল যে হিন্দু নেতারা আর ওমুখো হন না বরং ফিরহাদ হাকিমের মতো মুসলমান নেতা বাড়িতে সরস্বতী পূজা, ভ্রাতৃ দ্বিতীয়ার ফোঁটা নেওয়া শুরু করেছেন? আর আমাদের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী তো হিজাব পরে ইফতার পার্টিতে যোগ দিতেন এবং বাংলার পরিবর্তে ইসলামি শব্দ (আরবি) আউড়াতেন, সেই তিনিই ২০১৬ সালের পর থেকে দেবী দুর্গা-সহ সমস্ত দেব-দেবীকে নিয়ে মাতামাতি করছেন কেন?

পশ্চিমবঙ্গে আমার মতো দিদি অনুরাগী হাজারে হাজারে লাখে লাখে মানুষ আছেন। তাঁরা সবাই দিদির এবং তাঁর দলের প্রতিটি ক্রিয়াকলাপকে চোখ বুঁজে সমর্থন করেন। কিন্তু ইদানীং দেখা যাচ্ছে কিছু ঠোঁটকাটা লোকের আবির্ভাব হয়েছে। তারা দিদির সব কাজের কুব্যাখ্যা করতে ওস্তাদ। তাদেরই মধ্যে একজন ফিরহাদ হাকিমের এক বোনের কাছ থেকে ভাইফোঁটা নেওয়া দেখে টিপ্পনী কেটে বললেন— একটা ঘটনার কথা আপনারা জেনে রাখুন। প্রথম হবু সন্তানের এক জননী তার মাকে বলল— 'মা আমার যখন প্রসব ব্যথা শুরু হইব তখন তুমি আমাগো ডাইক্যা দিও। আর আমার লগে ঠাকুর দেবতাকে একটুখন

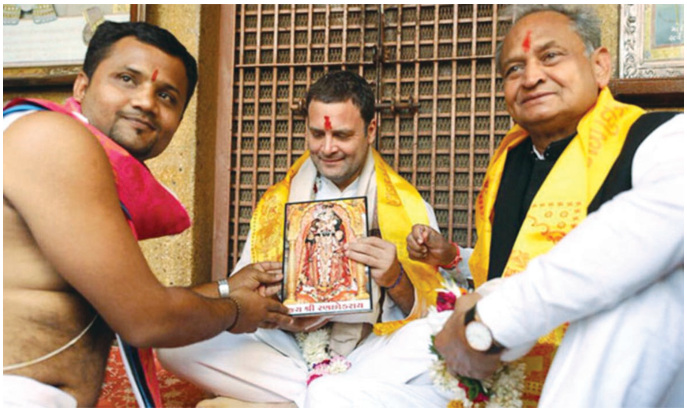

ডাইকো। আমি এখন ঘুমাইতে যাইতাছি।' মা তখন তাকে কইলেন— 'আমাগো তোমারে ডাকতে হইব নাই। যার ডাকা সেই তোমাগো ঠেইলা ঘুম ভাঙাইবো। তখন তুমিই ব্যথা থাইকা মুক্তি পাওয়ার লগে মা ষষ্ঠি, মা দুগ্গা, মা কালী-সহ তেত্রিশ কোটি দেবতারে একসঙ্গে ডাকা শুরু করবা।' কথাটা বুঝলে না? বলে ভদ্রলোক আমার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন। তারপর তিনি নিজেই শুরু করলেন— আর একমাস কয়েকদিন পরেই ২০২১ সাল আসবে। সেই 'একুশেই' পশ্চিমবঙ্গের সব রাজনৈতিক দলগুলিই একটা 'সরকার' প্রসব করতে চায়। সেই প্রসব ব্যথাই শুরু হয়েছে সব দলের। তার মধ্যে শাসকদলের ব্যথাটা এখনই খুব বেশিরকম বেড়ে গেছে। কারণ দিলীপ ঘোষেরা সরকারের গায়ে যেখানে সেখানে ধাক্কা দিচ্ছে তো। তাই দিদির দলের হিন্দু-মুসলমান সব নেতারা মিলে হিন্দু-দেবীকে ডাকা এবং হিন্দু সংস্কৃতি পালন করার নামে ভণ্ডামি শুরু করেছে। পশ্চিমবঙ্গের ভোটার নামক দেব-দেবীরা কোন দলের প্রতি সদয় হবেন দেখার জন্য আমাদের আরও পাঁচ মাস অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

অনেকদিন আগে থেকেই দেশের স্বঘোষিত ধর্মনিরপেক্ষবাদীরা বিজেপি দলের গায়ে হিন্দুত্ববাদী তক্‌মা জুড়ে দিয়েছে। কেননা তারা নিজেদের ইসলামের একনিষ্ঠ সেবক মনে করতেন আর পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, কিন্তু সেই 'পশ্চিমের' হাওয়া ঘুরে এখন 'উত্তর' আর 'পূবের' হাওয়া বইতে শুরু করেছে। তারই ফলে খ্রিস্টান রাহুল গান্ধী পৈতা ধারণ করে কোনো রকমে ধুতি পরে মন্দিরে যান, সূর্যকান্তরা রাম সপ্তাহ পালন করেন আর ফিরহাদ হাকিমকে সরস্বতী পূজা করতে হয়, আবার কোনো হিন্দু বোনের কাছ থেকে ফোঁটাও নিতে হয়। ▯

আতঙ্কের প্রহরে মানুষের শুভবুদ্ধির বিকাশ

বিশ্বজিৎ মণ্ডল

বর্তমান বিশ্ব প্রতিনিয়ত করোনা নামে এক অদৃশ্য শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে চলেছে। এই যুদ্ধের শরিক আমাদের ভারতবর্ষও। আমরা ভারতের জনগণ সর্বশক্তি দিয়ে এই করোনা যুদ্ধে লড়াই করছি। চরম মুহূর্তে সারাদেশে চলেছে লকডাউন। নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য তথা ওষুধপত্র ছাড়া বাজার, হাট, দোকান, শপিংমল, গণপরিবহণ, ধর্মীয় স্থান, পর্যটন, নির্মাণ শিল্প ইত্যাদি সমস্ত কিছু বন্ধ ছিল। যার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে অর্থনীতিতে। তার ফলস্বরূপ কষ্টে অনাহারে দিন কাটছে ওইসব পেশার সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মানুষের । এই মানুষগুলোর পাশে দাঁড়িয়েছে সরকার ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, এই পরিচয়কেই এগিয়ে নিয়ে গিয়ে সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা, সোসাইটি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, বন্ধুদের গ্রুপ সমবেত ভাবে বা কোথাও কোথাও কেউ কেউ একক প্রচেষ্টায় এই অভুক্ত মানুষগুলোকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে। কেউ চাল, ডাল, আলু দিয়েছে, তো কেউ আবার রান্না করা খাবার দিয়েছে । আবার কেউ মাস্ক দিয়েছে তো কেউ স্যানিটাইজার দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য সচেতন করেছে। গীতায় অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করলেন, 'হে কৃষ্ণ! যেসব ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে অথচ শ্রদ্ধা সহকারে দেবতাদের পূজা করেন এবং দান করেন তাদের নিষ্ঠা কিরূপ?' এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে সপ্তদশ অধ্যায়ে :

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।

দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।। (২০)

অর্থাৎ দান করা কর্তব্য —এই মনোভাব নিয়ে যে দান দেশ কাল এবং পাত্র অনুসারে অনুপকারী ব্যক্তিকে নিষ্কাম ভাবে করা হয় অর্থাৎ প্রত্যুপকারের আশা থাকে না সেই দানকে সাত্ত্বিক দান বলা হয়। এদিক দিয়ে আমাদের সমাজ প্রশংসার উর্ধ্বে। কিন্তু এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সত্যি সত্যিই কি আমরা সাত্ত্বিক দান করছি? এই দানের পিছনে নাম যশ খ্যাতি বা প্রচার তথা প্রতিষ্ঠা পাবার সুপ্ত ইচ্ছা মনের কোণে নেই তো? কাকে দান করা উচিত, কোথায় দান করা উচিত? এসব কি একবারও ভেবেছি? এই দানের ফলে আমাদের অজান্তেই আমরা কি পাপ করে ফেলছি নাকি পুণ্য করছি? এই দান করার পূর্বে কি আমরা একবারও ভেবেছি যে দান কত প্রকারের হয়? আমরা কোন প্রকার দান করছি? কোন প্রকার দানকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করা আছে শাস্ত্রে?

আদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।

অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্।। (১৭/২২ গীতা)

অর্থাৎ যে দান মান-সম্মানবর্জিত, অবজ্ঞা সহকারে, অযোগ্য স্থানে, অসময়ে এবং অনুপযুক্ত পাত্রে করা হয় তাকে বলে তামসিক দান। উদাহরণ হিসেবে ধরুন আপনি কোনো স্থানে কোনো বিশেষ গোষ্ঠী বা ব্যক্তিবর্গকে দান করেছেন সেই সময় যদি অন্য কোনো ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাকে অপমান করে অবজ্ঞা সহকারে দান করা হয় তখন সেই সেই দান তামসিক দানের মধ্যে পড়ে। আবার তামসিক ব্যক্তিদের মধ্যে এইরকম ভাব দেখা যায় যে আমি নিজের জিনিস দিচ্ছি, আমার যখন ইচ্ছা, যাকে ইচ্ছা আমি দেব। তারা এই ভাবে শাস্ত্র নির্দেশের অমর্যাদা ও অপমান করে দান করে। কারণ, তার মধ্যে দানের কোনো মূল্যবোধ থাকে না, থাকে শুধু অর্থের গুরুত্ব।

যত্তু প্রত্যুপরাকার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।

দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দান রাজসং স্মৃতম্।। (১৭/২১ গীতা)

অর্থাৎ যে দান পরোপকারের আশায় ক্লেশ সহকারে এবং ফল প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে করা হয়, তাকে বলা হয়ে থাকে রাজসিক দান।

এই রাজসিক দান খুবই উদ্দেশ্যপূর্ণ ও কুটিল। আমি তাকেই দান করবো যে আমাকে উপকার করেছে বা উপকার করতে পারে, আবার আমার মনের ইচ্ছা নেই অথচ পরিবেশ পরিস্থিতির চাপে দান করতে বাধ্য হচ্ছি, এই ধরনের মানসিকতা রাজসিক দানের লক্ষণ। এখন সময় হয়েছে দিতে হবে, না দিলে লোকে কী বলবে, সমাজে আমার সম্মান থাকবে না, এই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন কিছু ব্যক্তিও থাকেন, তাঁরা দানের আগে ভাবেন কতটা দেব। এতটা দিয়ে দিলে আমি কী খাবো, বা আমি এতটা কোথায় পাবো? আবার কখনো সে ভাবে এতটা দরকার নেই, ওর এতটা লাগবে না একটু কম দিলেও হবে, বেশি দিলে গ্রহীতার স্বভাব নষ্ট হবে, এই সব চিন্তাভাবনা থেকে রাজসিক ব্যক্তিরা দান করে থাকেন।

আবার বর্তমান যুগে এই রাজসিক দানের অন্য রকম ব্যাখ্যা আমরা পাই। বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা বা সংগঠন এই দানকে তাদের প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করে। এই দানের প্রচার সমাজের সামনে প্রকাশ করে নিজেদের বড়াই করে। আবার কোনো কোনো সংস্থা এই দানকে তাদের নাম যশ বা খ্যাতির মাধ্যম করে

তুলেছে। আবার যে ব্যক্তি বেশি অর্থ সাহায্য করেছে তাকে সামনে রেখে তার হাত দিয়ে দান করানো একটা প্রচলিত প্রথা হয়ে গিয়েছে বর্তমান কালে। উদ্দেশ্য— সে আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হবে ও আগামীদিনে আমি তার কাছ থেকে আরও অনেক বেশি সাহায্য পেতে থাকবো।

সর্বোত্তম দান হলো সাত্ত্বিক দান। সম্পূর্ণ নিরাসক্ত হয়ে কোনোরকম প্রত্যুপকারের আশা না করেই এই দান করা হয়। যার জিনিস তাকেই ফিরিয়ে দিচ্ছি এই মানসিকতা নিয়ে সর্বদা দান করা উচিত। এর ফলে মনে অহংবোধ আসে না। নাম যশ খ্যাতি লাভের প্রত্যাশাও জাগে না। এই সাত্ত্বিক দান হলো প্রকৃতপক্ষে ত্যাগ, আর এই ত্যাগ স্বার্থশূন্য হবার ফলে প্রতিদানে কিছু পাবার আশা থাকে না। মনে যদি নাম যশ খ্যাতি বা অন্য কোনো প্রতিদান পাবার বাসনা জেগে যায় তখনই সেই দান রাজসিক হয়ে পড়ে। এর পাশাপাশি তুলসীদাস রচিত রামচরিত মানসে বলা হয়েছে যে, 'জেন কেন বিধি দিনহে দান করই কল্যাণ'। (উত্তরকাণ্ড-১০৩(খ))

অর্থাৎ যেন তেন প্রকারে দান করলেই মঙ্গল। এর ফলে পাঠকের মনে হতেই পারে যে এই দুই গ্রন্থের মত কেন বিপরীতার্থক?

এই প্রশ্নের উত্তর কবি তুলসীদাস তার আগের পঙ্‌ক্তিতেই বলেছেন :

'প্রগট চারি পদ ধর্মকে কলি মুহ এক প্রধান' অর্থাৎ চরণ চতুষ্টয় (সত্য, দয়া, তপস্যা ও দান) প্রসিদ্ধি যাতে কলিযুগে একটি (দানরূপ) চরণই প্রধান। যুগের নিয়মানুসারে, (১) সত্য যুগে সমতা, বিজ্ঞান, মনের প্রসন্নতা ও সত্ত্বগুণের প্রভাব মানুষের ভিতর বিদ্যমান, (২) ত্রেতা যুগে মানুষের মনে সত্ত্বগুণ অধিক, সঙ্গে রজোগুণও অল্প প্রভাব বিস্তার করে থাকে, (৩) দ্বাপর যুগে রজোগুণের প্রভাব অধিক সঙ্গে সত্ত্ব ও তমোগুণের স্বল্পাধিক প্রভাব মানুষের মনে বিরাজমান থাকে, (৪) সর্বশেষে তমোগুণের প্রাবল্য ও রজগুণের স্বল্পতা, চতুর্দিকে কলহ-বিবাদ এইসব কলিযুগের প্রভাব। তাই কলিযুগে মুক্তির পথও রয়েছে এই রামচরিত মানসে :

কাল ধর্ম নাহি ব্যপহিঁ তাহী, রঘুপতি চরণ প্রীতি অতি জাহী।। (৭/১০৩ দোহা ৩)

অর্থাৎ যার অন্তরে শ্রীরঘুপতির শ্রীচরণে প্রগাঢ় অনুরাগ থাকে তাকে কালধর্ম (যুগধর্ম) প্রভাবিত করতে পারে না। যেহেতু কলিযুগে মানুষের অন্তর অত্যন্ত কলুষিত ,তাই কলিযুগে শাস্ত্রবর্ণিত এই সুযোগ দেওয়া হয়েছে যে দান করলেই কল্যাণ, 'দানমেকং কলৌ যুগে' (মনুস্মৃতি ১/৮৬)। এর ফলে মানুষের স্বভাবে দান করার প্রবৃত্তি জাগ্রত থাকবে, যা পরে কখনো কোনো জন্মে তার কল্যাণও করতে পারে, কিন্তু দান করা যদি বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে দান করার স্বভাবই আর তৈরি হবে না। সেই জন্য তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে যে 'শ্রদ্ধেয়া দেয়ম্ অশ্রদ্ধয়া দেয়ম্'।। (১/১১)। অর্থাৎ শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করা উচিত, অশ্রদ্ধার সঙ্গেও দান করা উচিত।

তাই এই করোনা মহামারীর ফলে বিভিন্ন মতবাদ, আদর্শবাদ ও পন্থাবলম্বী তথা অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষ, এমনকী নাস্তিকরাও যারাই এই বিপদে সাধারণ মানুষের সাহায্যার্থে হাত বাড়িয়েছিলেন, তারা নিজেদের অজান্তেই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তথা হিন্দু শাস্ত্রকেই অনুসরণ করেছেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এই করোনা মহামারী আমাদের আবার ধর্মের পথেই ঠেলে দিয়েছে।

তমসো মা জ্যোতির্গময়— অর্থাৎ অন্ধকার থেকে আলোর পথে আমাদের সমাজ এগিয়ে চলেছে, মঙ্গলের দিকে এগিয়ে চলছে এবং সমাজ ধর্মময় হয়ে উঠছে ধীরে ধীরে। □

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ,
কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা

ইন্দুমতী কাটদরে

কামপুরুষার্থ

আত্মতত্ত্বের মনে সংকল্প জাগায় 'একোহহম্ বহুস্যাম' । ফলস্বরূপ এই সৃষ্টির উৎপত্তি হয়েছে। সৃষ্টির সৃজন পরমাত্মার ইচ্ছাশক্তির পরিণাম। এই ইচ্ছাশক্তি মানুষের অন্তঃকরণে কামরূপে বাস করছে। অর্থাৎ কামেচ্ছা মানুষের জীবনের কেন্দ্রবর্তী তত্ত্ব। উপেক্ষা করা অসম্ভব।

কামের অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা। মানুষের মন ইচ্ছার ভাণ্ডারস্বরূপ। ইচ্ছা পূরণ করা মানুষের লক্ষ্য। ইচ্ছা পূরণের জন্য মন অখণ্ড প্রয়াস করে থাকে।

মন হচ্ছে ইন্দ্রিয়সমূহের প্রভু। সেই জন্যই ইন্দ্রিয়গুলোকেও নিজের ইচ্ছা পূরণের কাজে লাগিয়ে থাকে। ইন্দ্রিয়সমূহ বিষয়ের দিকে আকর্ষিত হয়। সে তার প্রভুর জন্য সদাই কার্যরত থাকে। ফুল ও অন্যান্য পদার্থের মধুর গন্ধকে নাক মন পর্যন্ত পৌঁছে দেয়। কান মধুর ধ্বনিকে মন পর্যন্ত পৌঁছিয়ে তাকে সুখী করে। বাসনা বিভিন্ন পদার্থের স্বাদ নিয়ে মনকে সুখ দেয়। ত্বক অনেক প্রকারের মোলায়েম স্পর্শের অনুভূতি দ্বারা মনকে সুখ প্রদান করে। চোখ অনেক প্রকার সুন্দর দৃশ্যকে গ্রহণ করে মনকে আনন্দ দেয়। মানুষের বাইরের যে বিশ্ব আছে তার সমস্ত সুখানুভূতি ইন্দ্রিয় সমূহের মাধ্যমে মন অবধি প্রাপ্ত হয় আর মন তার উপভোগ করতে নিরন্তর প্রয়াসী হয়।

অবশ্য মনের এই সুখ একরকমই থাকে না। সুন্দর অনুভবের সঙ্গে খারাপ অনুভবও জুড়ে থাকে। গন্ধ সুগন্ধ হয়, দুর্গন্ধও হয়। স্বাদ মধুর হয়,কটুও হয়। দৃশ্য সুন্দর হয়, অসুন্দরও হয়। ধ্বনি মধুর হয়, কর্কশও হয়। স্পর্শ মোলায়েম হয় , কঠোরও হয়। খারাপ অনুভূতি মন পর্যন্ত পৌঁছালে মনকে সুখের পরিবর্তে তা দুঃখও দিয়ে থাকে। মন এ থেকে বিমুখ হবার অথবা এদের দূরে রাখবার প্রয়সও করে। সে সর্বদাই সুখ লাভ করতে চায় ও দুঃখ থেকে দূরে থাকতে চায়, কিন্তু এমনটা হয় না। সুখ আছে তো দুঃখ আছেই। এইজন্য মনের সুখ প্রাপ্তিরজন্য এবং দুঃখ থেকে দূরে থাকবার অস্থিরতা নিরন্তর চলতেই থাকে।

ইন্দ্রিয়গুলো থেকে প্রাপ্ত এই সুখানুভূতিগুলো থেকেও মনের কামবাসনা অনেক বিশাল। কাম মনের মধ্যে লোভ, মোহ, ক্রোধ, মদ-মাৎসর্য রূপে ধারণ করে থাকে। লোভ দ্বারা প্রেরিত বিভিন্ন হয়ে সে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে থাকে। সে আবশ্যকতার চেয়ে অধিক বস্তু সংগ্রহ করতে ব্যস্ত থাকে। মোহের দ্বারা প্রেরিত হয়ে সে পদার্থ, ব্যক্তি ও অনুভূতিতে আসক্ত হয়ে যায়। আসক্তির কারণে সে সব সময়ই তাদের সঙ্গেই থাকতে চায়। সঙ্গে থেকে সুখ পাওয়া যায় এবং দূরে গেলে দুঃখী হতে হয়। মদের দ্বারা প্রেরিত হয়ে সে সৌজন্য ভুলে যায় এবং অপরের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করে মানুষকে দুঃখ দিয়ে থাকে। মাৎসর্যের দ্বারা প্রেরিত হয়ে সে সুখ প্রদানকারী বস্তুগুলোকে সব নিজের কাছেই রাখতে চায়। নিজের কাছে নেই অথচ অপরের কাছে আছে এমনটা হলে তার দুঃখ হয়ে থাকে। নিজের কাছে এবং অপরের কাছেও আছে তাতেও তার দুঃখ হয়ে থাকে। নিজের কাছে আছে অথচ অপরের কাছে নেই তবে সে সুখ লাভ করে, মনে কামনা সুখের ইচ্ছাও সদৈব থেকে থাকে এবং তা বিবিধ রূপ ধারণ করে থাকে। মনকে সুখ দেবার মতো কিছু না হলে সে দুঃখী হয়ে থাকে এবং দুঃখ ক্রোধে পরিণত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য প্রভৃতিকে মানুষের ষড়রিপু বলা হয়। এসব মনে বাস করে এবং মানুষকে অনেক প্রকারের ক্রিয়াকলাপ করবার জন্য প্রেরিত করে। মন যে সুখের ইচ্ছা করে তার কারণে মানুষের মান, যশ, গৌরব কীর্তি ইত্যাদির আকাঙ্ক্ষা নিরন্তর চলতেই থাকে। এসব পাবার জন্যও সে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যায়।

মানুষের এরূপ প্রয়াসের জন্য সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষ হিংসার রূপ ধারণ করে। হিংসা বিনাশের কারণে পরিণত হয়। আমাদের চাপপাশে ও বিশ্বে এই সংঘর্ষ হিংসা ও বিনাশ আমরা দেখতেই পাচ্ছি। এসবেরই মূল হচ্ছে কাম।

কামের একটা অত্যন্ত মোহনীয় ও আকর্ষণীয় রূপও আছে। জ্ঞানেন্দ্রিয়গুলোর অনুভূতিতে আসা রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ -জগতে মন নিজের একটা সুন্দর সংসার গড়ে তোলে। গড়বার এই কাজে সে কর্মেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধিকেও কাজে লাগায়। নিজের আবশ্যকতাগুলোকে সে সুখ প্রদানকারী অনেক রূপের মাধ্যমে পেতে চায়। এই বৈচিত্র্যের জন্য তার কাছে কল্পনাশক্তি রয়েছে। তার শরীরের পোষণের জন্য অন্ন আবশ্যক, কিন্তু কাম ওই অন্নকে বিভিন্ন স্বাদযুক্ত অনেক খাদ্য পদার্থ রূপে প্রাপ্ত করতে চায়। বস্ত্র তার শরীরের রক্ষার জন্য আবশ্যক কিন্তু মানুষ এই বিশ্ব থেকে আলাদা হতে চায় না। জন্ম-জন্মান্তর ধরেই সে এই সুখ পেতে চায়। বাস্তবে কামের দ্বারা প্রেরিত হয়ে যে কার্যকলাপই আমরা করে থাকি তা দ্বারাই আমাদের ভাগ্য তৈরি হয়ে থাকে। তা থেকেই সংস্কার গড়ে ওঠে। ওই কার্যকলাপ আমাদের কর্ম হয়ে থাকে। ওইসব কর্মের ফল রয়েছে। ওই কর্মফলে ভোগ করবার জন্য পুনর্জন্ম হয়। কর্ম, কর্মফল, এবং

ফলের ভোগ করতে গিয়ে কৃত নতুন কাজ— এই প্রকার জন্ম-জন্মান্তরের চক্র থেক মুক্ত হতে চায় না। সে ভোগ করবার জন্য পুনঃ পুনঃ আসতে চায়। তারা এটাকে বন্ধন মনে করে না। কিন্তু অভিজ্ঞ ও জ্ঞানী লোকেরা এই সংসারকে কামনাময় এবং দুঃখময় বলেই মনে করেন এবং তা থেকে মুক্তি পেতে চান।

কামের এই সংসার কি এতটাই হেয়? তাকে কি তাহলে বর্জন করাই দরকার? এতে কি শুধু দুঃখই আছে? যদি এটা এতটাই বর্জন যোগ্য হয় তবে পরমাত্মা তাকে তৈরিই বা করলেন কেন?

এ সম্বন্ধে দুটো পথ আছে। এক হচ্ছে কামনার পূর্ণ ত্যাগ । আমার কিছু চাই না এমন সংকল্প করে নিজ প্রয়োজনকে কম করতে থাকা এবং ধীরে ধীরে নিঃশেষ করতে থাকা। এমন ত্যাগীকে ভারতে সন্ন্যাসী বলা হয়ে থাকে। একজন সন্ন্যাসীর ন্যূনতম আবশ্যকতা কেবল হাতের অঞ্জলি পরিমাণ ভিক্ষা এবং বৃক্ষতলে আশ্রয়— 'করতল ভিক্ষা তরুতল বাস' বলা হয়ে থাকে। তপশ্চর্যা ও সংযম পালন করে সে নিজের আবশ্যকতাকে কম করে থাকে। সে নিজের আত্মীয় পরিজনদের ত্যাগ করে। সে নিজের নাম ও সমস্ত পরিচয়কে পরিত্যাগ করে। কিন্তু এসব পদার্থকে এভাবে ত্যাগ করা সরল নয়, বরং অত্যন্ত কঠিন। সঙ্গে সঙ্গে তাতে একটা বিপদও আছে, সমস্ত পদার্থকে ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাবার পরও কখন যে কামনার উদয় হয়ে পড়বে তা কেউ নিশ্চিত করে বলতে পারে না। কামনা খুবই বলশালী হয়ে থাকে আর খুব চতুরতার সঙ্গে সে ব্যক্তিকে বেঁধে ফেলে। এজন্যই সন্ন্যাসের পথ হচ্ছে খুবই কঠিন।

দ্বিতীয় হচ্ছে কামের সঙ্গ ত্যাগ করা। একে গীতায় কর্মফল ত্যাগ বলা হয়েছে। আসক্তি কম করা, মোহ কম করা, আশা না করা এবং নিষ্কাম ভাবে কাজ করা কামনা থেকে মুক্তির পথ। এতে কামকে নয় বরং তার বন্ধনকে ত্যাগ করতে হয়। কামনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যে কাজ করা হয়ে থাকে তাকে ত্যাগ করাতে সম্ভব নয়। একজন সন্ন্যাসীরও খাদ্য ও থাকার জয়গারহ প্রয়োজন হয়। ওই আবাসকে আকার ও প্রকার প্রদান করে

বসের অনুকূল তৈরি করে। কামের এই প্রবৃত্তি থেকেই অনেক প্রকার শিল্প এবং কারিগরির বিকাশ হয়েছে। শিল্প ও কারিগরির ক্ষেত্রে মানুষ উৎকৃষ্টতা লাভ করেছে এবং কালজয়ী শিল্পকর্মের সৃজন করেছে। সংগীত, চিত্রকলা, কাব্য, শিল্প, স্থাপত্যকলা ইত্যাদির অদ্ভুত আবিষ্কার এই বিশ্বর শোভা বাড়িয়েছে। কাম মানুষের দেহকেও অনেক প্রকার সৌন্দর্য প্রসাধন ও অনেক প্রকার বস্ত্রালংকার সুশোভিত করে থাকে।

এর মধ্যেই অনেক প্রকার শাস্ত্রের রচনা হয়েছে। অনেক প্রকার শিল্পের বিকাশ হয়েছে। অনেক প্রকার শৈলীর বিধান তৈরি হয়েছে। অনেক উৎসব আয়োজনের প্রচলন তৈরি হয়েছে। দিনচর্যায়, ঋতুচর্যায়, জীবনচর্যায় মানুষ অসংখ্য প্রকারের আমোদ-প্রমোদের আয়োজনকে জুড়ে দিয়েছে এবং সেই সবকিছুরই মূল প্রেরণার উৎসও হচ্ছে কাম। মানুষ এই আমোদ-প্রমোদের সংসারে এতটাই আকণ্ঠ ডুবে যায় যে একেই নিজের জীবনের লক্ষ্য মনে করে। এসব পাবার প্রচেষ্টাই তার কাছে পরম পুরুষার্থ মনে হয়। এসব পেয়ে গেলে তার জীবন সার্থক হয়ে গেল এমন প্রতীত হয়ে থাকে।

এ সমস্ত সংসার হচ্ছে কামেরই আবিষ্কার। ভগবান শঙ্করাচার্য একে মনোরাজ্য বলেন এবং তাকে মিথ্যা মনে করেন। এতে যত সুখই আছে, তা হচ্ছে সুখের আভাস, পরিণামে তো ওটা দুঃখই হয়ে থাকে। আমাদের সামাজিক সম্বন্ধ, আমাদের বিভিন্ন ব্যবস্থা, আমাদের সমস্ত শাস্ত্র এই সংসারেরই অন্তর্গত নিজের ব্যবহার করে থাকে।

কামনা মনের রূপ ধারণ করে আমাদের অস্তিত্বের অঙ্গে পরিণত হয়েছে। এটা অত্যন্ত বলবান, জেদি, আগ্রহী এবং প্রভাবী। এর ওপর বিজয় পাওয়া অত্যন্ত কঠিন কাজ। এর ওপর বিজয় পেতে হবে এমন বিচারও আমাদের মনে আসেনা। কাম নিজের সন্তুষ্টির জন্য, ইন্দ্রিয়, শরীর, বুদ্ধির কোনো পরোয়া করে না। স্বাদের সন্তুষ্টির জন্য সে এমন কোনো বস্তুই খাওয়া থেকে বিরত হয় না যাতে স্বাস্থ্য খারাপ হয়। ইন্দ্রিয়সমূহ তার উপভোগের মাধ্যম হলেও সে তার সুরক্ষার পরোয়া করে না এবং বিষয় সুখ নিতেই থাকে। এই কামনার সন্তুষ্টির জন্য বুদ্ধি নিজের সমস্ত শক্তি খরচ করে থাকে। বুদ্ধি, কল্পনা কুশলতার আবিষ্কার এতটাই চমৎকার সংসারে সব মানুষেরই নিজের একটা ভূমিকা রয়েছে। ওই ভূমিকা অনেক কর্তব্যের বিধান বানিয়েছে। এই কর্তব্যের পালন না করলে বড়ো অব্যবস্থা হয়ে যাবে। এজন্যই কর্মকাণ্ডের ত্যাগ করা ঠিক নয়। কর্ম করাই দরকার কিন্তু তার ফলাকাঙ্ক্ষা না করেই করা দরকার। উদাহরণ স্বরূপ খাবার তো খেতেই হবে কিন্তু তার স্বাদ মনকে সুখানুভূতি দিতে পারে এই প্রত্যাশায় নয় বরং শরীরকে পোষণ দেয় এবং মনের ভাব সমূহকে সংস্কারিত করে কথা সত্ত্ববুদ্ধির প্রাপ্ত করা চাই। খাবার রান্না করা দরকার কিন্তু তা স্বার্থ, ভয় বা বাধ্য হয়ে নয়, বরং অন্নগ্রহণকারী সাক্ষাৎ ভগবান এবং তার জন্য রান্না করা এবং তার মাধ্যমে পরমাত্মার সেবা হচ্ছে এই মনোভাব নিয়েই রান্না করা উচিত। কর্তব্যকর্মকে কখনও ছাড়বে না, কর্তব্যকর্ম করবার সময় দুঃখী না হওয়া, কর্তব্যকর্ম অদক্ষ হাতে অথবা অযত্নে না করাই নিষ্কাম ভাবের দিকে নিয়ে যায়। অনেকবার এমন হয় যে এই সব সাবধানতার পরেও কর্ম ভালো হয় কিন্তু ফলের আশা অবশ্যই থেকে যায়। ফল না পেলে কর্ম করা মানুষ যদিও বা না ছাড়ে, দুঃখ অথবা অভিযোগ কিন্তু অবশ্যই থেকে যায়। এমনটা হলে কামনা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না এবং কামনাজনিত দুঃখ থেকেও মুক্তি পাওয়া যায় না।

(ক্রমশ)

ভাষান্তর : সূর্য প্রকাশ গুপ্ত (প্রাক্তন অধ্যাপক)

স্বাধীনতার ৭৩ বছর পরেও সার্বভৌমত্ব কালিমালিপ্ত

অতি সম্প্রতি পাকিস্তান অধিকৃত গিলগিট, বালটিস্তানকে পূর্ণাঙ্গ প্রদেশের স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পাকিস্তান এবং রাষ্ট্রপতি ড. আরিফ আলভি ১৫ নভেম্বর এই অঞ্চলের নির্বাচনের দিন ঘোষণা করেছেন। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র অনুরাগ শ্রীবাস্তব পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন গিলগিট, বালটিস্তান কখনই পাকিস্তানের ছিল না, আর আগামীদিনেও হবে না। সেখানে নির্বাচনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আন্তর্জাতিক মঞ্চে বার বার এ দাবি করেছে ভারত।

আলোচনার প্রেক্ষিতে দুঃখের সঙ্গে বলতেই হয় যে, স্বাধীনতার ৭৪ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে তবুও দেশের একটা অংশের সার্বভৌমত্ব এখনও কালিমালিপ্ত।

আমরা যদি অনুপুঙ্খ দৃষ্টিতে খুঁজে দেখি, দেখবো, দেশের স্বাধীনতা দীর্ঘ আন্দোলনের ও বিপ্লবের ফলশ্রুতি হলেও স্বাধীনতার প্রাক মুহূর্তে সুস্থ-সুন্দর আলোচনা হয়নি। একটা হঠকারী ও সাম্প্রদায়িক শক্তির আগ্রাসনে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নিরীহ হিন্দুদের রক্ত ঝরিয়ে এদেশ বিভাজন দয়েছ এবং তার ফলেই এই সমস্যার সৃষ্টি করেছে। উল্লেখ্য, মুসলিম লিগের দ্বিজাতিতত্ত্বে সমর্থন জানিয়েছিল কমিউনিস্টরা। বলেছিল, 'পাকিস্তান দিতে হবে, তবেই ভারত স্বাধীন হবে'। অন্যদিকে গদিলোভী জওহরলাল নেহরুর নির্বুদ্ধিতা ও অদূরদর্শিতা এর কারণ। ফলে গান্ধীজীর অহিংস দর্শন ও তাঁর মতো গৌরবময় ব্যক্তিত্বকে হত্যা করা হয়েছে, যিনি আফ্রিকায় কৃষ্ণকায় ও নির্যাতিত মানুষদের নিয়ে একটি মঞ্চ গঠন করে এক অহিংস মহামানব রূপে বিশ্বে প্রতিভাত হয়েছিলেন। দুঃখের বিষয়, দেশের তথাকথিত প্রগতিশীল ও কমিউনিস্ট রা এই কলঙ্কময় ইতিহাসের জন্য দায়ী। এজন্যই নিজেদের দোষ ঢাকতে তারা হিন্দুদেরই সাম্প্রদায়িক বলে কটাক্ষ করে, আরও নির্যাতন করে থাকে।

এমতাবস্থায় ঘটনাবহুল ইতিহাস ঘেঁটে এর সমাধানের পথ খুঁজতে বর্তমান মোদী সরকারকে দায়িত্ব নিতেই হবে। তবে দ্বিতীয়বার মোদী সরকার তিনটি বিশেষ সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে দেশবাসী ও বিশ্ববাসীর কাছে দেশের গৌরবময় ভূমিকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। অমানবিক তিনতালাক বাতিল, কাশ্মীরে গণতন্ত্র স্থাপন ৩৭০ ধারা বাতিলের মাধ্যমে, রামমন্দির-বাবরি মসজিদ মামলার নিষ্পত্তি ও রামমন্দির নির্মাণের পথ সুগম করা। তবে রামমন্দির নির্মাণের গৌরবময় দৃষ্টান্ত স্থাপনে দেশের সর্বোচ্চ আদালাতের ভূমিকাও অপরিসীম।

পক্ষান্তরে পাকিস্তানের জন্মদাতা জিন্নার একটি রাজনৈতিক তত্ত্ব ছিল Politics is nothing, only for blab, এটা প্রমাণ করে দেশভাগের পর বিনিময় প্রথা চালু করা। কারণ মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান। মুসলমানরা পাকিস্তানে চলে যাবে এটাই বাস্তব সত্য। কিন্তু কূটনৈতিক লিয়াকত আলির সুধাস্নিগ্ধ বাণীতে নেহরুজী বিনিময় প্রথায় রাজি হয়ে নেহরু-লিয়াকত চুক্তিতে আবদ্ধ হন। চুক্তিতে উল্লেখ ছিল, উভয় দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা প্রদান ও ভূ-সম্পদ রক্ষা করা হবে। কিন্তু পাকিস্তান তা করেনি। পরবর্তীকালে বাংলাদেশের জন্ম দিতে ভারতের অর্থ-সেনাক্ষয় সবই বৃথা গেল। সেখানে আরও বেশি করে হিন্দুদের উপর ধর্ষণ, নির্যাতন নেমে এসেছে। পাকিস্তানে সংখ্যালঘুরা ছিল ৯ শতাংশ, বর্তমানে ৩ শতাংশ। বাংলাদেশে ছিল ২৯ শতাংশ, বর্তমানে ৮ শতাংশেনেমে এসেছে।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে উভয় দেশে সংখ্যালঘুদের ছেড়ে আসা ভূ-সম্পত্তির দাবি রাষ্ট্রসঙ্ঘে তুলে ধরা ছাড়া কোনো পথ আছে কি?

ভারতে যেভাবে জনসংখ্যার চাপ পড়ছে তাতে ভারতের সমস্ত জনসাধারণের সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন যে এটা বলার অপেক্ষা রাখে না।

—**রবীন্দ্রনাথ রায়,**
সাহেবের হাট, কোচবিহার।

হিন্দু রাষ্ট্রের দাবিতে আমরণ অনশন

ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করার দাবি নিয়ে গত ১৬.৯.২০২০ থেকে অনশনে বসেছিলেন অযোধ্যার সাধু পরমহংস দাস বাবাজী। প্রায় মাসখানেক অতিবাহিত হলে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় সংবাদমাধ্যমে খবর জানতে পেরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তাঁকে ফোন করেন এবং তিন মাসের মধ্যে এ বিষয়ে আলোচনায় বসার আশ্বাস প্রদান করেন।

বাংলা সংবাদমাধ্যমে এই খবর প্রকাশ পাবার পর আমরা ৫ জন পশ্চিমবঙ্গ থেকে অযোধ্যায় তাঁর সঙ্গে দেখা করার ও সমর্থন জানানোর জন্য সংকল্প করি এবং ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করার দাবিতে সমর্থন জানাতে গত ২৯ অক্টোবরে অযোধ্যায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। এই সাক্ষাৎকারে তিনি জানান যে জন্ম নিয়ন্ত্রণ, অভিন্ন দেওয়ানি বিধি, গোরক্ষা ও লাভজেহাদের বিরুদ্ধে কড়া আইন প্রণয়ন এবং সর্বোপরি ভারতকে অবিলম্বে হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করার দাবিতে তিনি অনশনে বসেছেন। লাভ জেহাদ, ল্যান্ড জেহাদ, ব্যবসা জেহাদ, ফিল্ম জেহাদ-এর বিরুদ্ধে আমাদের সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে লড়াই করতে হবে। আমরা অনেক সহ্য করেছি, আর অন্যায় নয়।

'রামচরিত মানস'কে জাতীয় গ্রন্থ ঘোষণা করার দাবিও তিনি জানান। এছাড়া পূর্ণ জনবিনিময়ের মাধ্যমে পাকিস্তান ও বাংলাদেশের হিন্দুদের দুর্দশা দূর করার ব্যাপারেও তিনি দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

রামমন্দিরপুনঃপ্রতিষ্ঠা মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় অযোধ্যার করসেবকপূরমে মহন্তজীর আখড়ায়। সেখানে মহাযজ্ঞ, কন্যাপূজন এবং জয় সীতারাম হনুমান নাম ১০৮ বার জপ করা হয় এবং অনুষ্ঠান শেষে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে দাবি জানান যে, ভারতীয় সংবিধানে প্রভু শ্রীরামের ছবি ছিল এবং সেখানে সেকুলার বলে কোনো শব্দ ছিল না। পরবর্তীকালে কংগ্রেসি চক্রান্তে প্রভু

শ্রীরামের ছবি বাদ দেওয়া হয়। ইন্দিরা গান্ধী এক শ্রেণীর ভোটারদের তোষণ করার জন্য সেকুলার কথাটি ঢুকিয়েছেন। সেখানে ভারতকে যবনদের সন্ত্রাসের হাত থেকে মুক্ত করতে অবিলম্বে জরুরি অবস্থা জারি করে 'হিন্দুরাষ্ট্র ঘোষণা করতে হবে। সেখানে আমি এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানাই যে ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করতে হবে, কারণ— (১) ভারতে হিন্দুদের সুরক্ষা ও মহিলাদের সম্মান রক্ষা করার জন্য, (২) মাদ্রাসা বন্ধ করে জেহাদি উৎপাদন বন্ধ করার জন্য, (৩) দশটা হিন্দু বিরোধী আইন বন্ধ করার জন্য, (৪) দেশজুড়ে সনাতন হিন্দু শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার জন্য, (৫) সারা পৃথিবীতে বসবাসকারী হিন্দুদের নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য।

পশ্চিমবঙ্গ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে যাবার কারণে মহন্ত পরমহংস উৎসাহিত হয়ে জানান পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুদের যবনদের দ্বারা রাজনৈতিক হত্যা করা হচ্ছে। হিন্দু মা-বোনেদের সম্মান লুঠ হচ্ছে। হিন্দুদের বিতাড়িত করা হচ্ছে সরকারি মদতে। সরকার ও পুলিশ হিন্দুদের কোনো সহায়তা দিচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের দুরবস্থার জন্য তিনি গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

—**আবীর গাঙ্গুলী,** মেদিনীপুর

মিমের চক্রান্ত সম্পর্কে সচেতন হতে হবে

বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর অত্যাচার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। হিন্দুদের জমিজমা অবৈধ ভাবে গ্রাস করা হচ্ছে। দেবোত্তর সম্পত্তি, শ্মশান বেআইনি ভাবে দখল করে নেওয়া হচ্ছে। কোনো প্রতিকার নেই। হিন্দু মেয়েদের অপহরণ, ধর্ষণ ও ধর্মান্তরিত করা এখন আকছার ঘটছে। প্রশাসন নির্বিকার। এদিকে ভারতে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানরা ক্রমশ নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে প্রশাসনের প্রশ্রয়ে ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, অপহরণ, ধর্ষণ প্রভৃতি নির্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলি মুসলমান ভোটব্যাঙ্কের লোভে নির্বিকার থেকে এদের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। আবার গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো জিন্নার নতুন অবতার হায়দরাবাদের আসাদুদ্দিন ওয়েসির মিম আত্মপ্রকাশ করেছে। এরা বিহারের সাম্প্রতিক নির্বাচনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গেও ডেরা বাঁধতে চাইছে। বিজেপির উত্থানে ভীত শাসকদল এদের তৃণমূলে শামিল করেছে। এদের উদ্দেশ্য হলো শাসকদলে থেকে শক্তি বৃদ্ধি করা। তারপরেই এরা স্বমূর্তি ধারণ করবে। মমতা ব্যানার্জি এটা যে বোঝেন না তা নয়। তবে ভোট বড়ো বালাই। মিমের এই চাল সম্পর্কে মানুষদের সচেতন হয়ে একুশের ভোটের জন্য ভাবতে হবে।

শুভব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়,
বড়বাজার, চন্দননগর, হুগলী

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :
AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

শঙ্কর শঙ্কর সম

রামানুজ গোস্বামী

বারাণসী। শিবঠাকুরের বারাণসী। শঙ্করের বারাণসী। ভারতের আধ্যাত্মিক রাজধানী। এখানকার প্রতিটি ধূলিকণায় ইতিহাসের পদচিহ্ন। পুরাণ-ইতিহাস, অতীত ও বর্তমান ভবিষ্যতের পথে হাত ধরাধরি করে হাঁটে এখানে। অতীত ইতিহাস এখানে অতীত নয়, এখানকার আকাশে-বাতাসে প্রতিনিয়তই ধ্বনিত হয় তার সুর। শুধু কান পাতার অপেক্ষা। এরকমই এক মাহেন্দ্রক্ষণের দিকে ফিরে তাকানো আরও একবার। স্থান পুরাণ-প্রসিদ্ধ কাশীর মণিকর্ণিকা ঘাট। এক যতিবর তাঁর শিষ্যদের নিয়ে চলেছেন গঙ্গাস্নানে। এমন সময় হঠাৎ দেখা গেল যে, এক ভীষণ দর্শন চণ্ডাল চারটি দুর্ধর্ষ কুকুরকে বেঁধে নিয়ে ওই একই পথ ধরে আসছে। যতিবর এই দৃশ্য দেখে কিছুটা দূর থেকেই সেই চণ্ডালকে সম্বোধন করে কুকুরগুলিকে একপাশে সরিয়ে নিয়ে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াতে বললেন। ফল হলো উলটো। সেই চণ্ডাল সন্ন্যাসীর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বিকট শব্দে হেসে উঠলেন। তারপর বিশুদ্ধ সংস্কৃতে যা বললেন, তার মর্মার্থ করলে দাঁড়ায়; 'আপনি কাকে সরে যেতে বলছেন? আত্মাকে, না এই দেহকে? আত্মা তো সর্বব্যাপী এবং সতত শুদ্ধ। সে কোথায় কীভাবে সরবে, তা অপবিত্রই বা হবে কীভাবে? আচার্য! গঙ্গাজলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র আর সুরামধ্যে প্রতিবিম্বিত চন্দ্র পৃথক হয় নাকি? আর যদি দেহকে সরে যেতে বলেন তবে দেহ তো জড়, তাই বা সরবে কী করে?'

আচার্যের ভুল ভেঙে গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ চণ্ডালকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন, 'যাঁহার সর্বভূতে সমজ্ঞান এবং যিনি তদনুরূপ ব্যবহার করেন, তিনি চণ্ডালই হউন আর দ্বিজই হউন তিনি আমার গুরু, তাঁহার চরণে শতকোটি প্রণাম'। তখন ঘটল সেই অলৌকিক ঘটনা। চণ্ডাল তাঁর স্বরূপ প্রকাশ করলেন। আচার্য দেখলেন, কোথায় চণ্ডাল! স্বয়ং বিশ্বনাথ সামনে দাঁড়িয়ে। বিশ্বেশ্বর স্বয়ং সন্ন্যাসীকে আশীর্বাদ করে জগতে বৈদিক ধর্মের পুনরুত্থানের কাজে অগ্রসর হওয়ার আদেশ দিলেন। সেই সঙ্গে দুটি প্রধান দায়িত্বের কথাও স্মরণ করিয়ে দিলেন। প্রথমটি হলো, বেদান্তের সারসত্য অদ্বৈতজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার আর দ্বিতীয়টি হলো, ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করা। এই মহান কার্যদ্বয়ের জন্যই স্বয়ং শঙ্করের অংশেই আবির্ভাব হয়েছিল এই সন্ন্যাসীর— ইনিই হলেন অদ্বৈতসূর্য জগৎবন্দিত শঙ্করাচার্য।

বলা হয়ে থাকে যে, 'শঙ্কর শঙ্কর সম'। সনাতন বৈদিক হিন্দু ধর্মের অবক্ষয় রোধ করে ধর্মকে স্বমহিমায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা ও ভারতবাসীকে ধর্মের যথার্থ আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য ব্রহ্মা ও দেবর্ষি নারদের অনুরোধে ভগবান শিব মর্ত্যলোকে দেহধারণ করে এসেছিলেন। ইংরেজি মতে ৬৮৬ খ্রিস্টাব্দ, ১২ বৈশাখ, শুক্লা তৃতীয়া তিথির মধ্যাহ্নকাল। অর্থাৎ আজ থেকে তেরশো বছরেরও বেশি আগে শঙ্করাচার্য এসেছিলেন। অতি স্বল্পায়ু। কেউ বলেন আঠাশ বছর, কেউবা বলেন বত্রিশ বছর। সে যাই হোক, সনাতন হিন্দুত্বের বার্তাবাহক, ধ্বজাধারী অবতার শঙ্কর ধর্মের গ্লানি মোচন করে, বৈদিক ধর্মকে রক্ষা করলেন। দিশাহারা ভারতবাসী খুঁজে পেল ধর্মাচরণের প্রকৃত পথ। অস্তায়মান অধ্যাত্মসূর্য ভারতের আকাশে পুনরায় মধ্যগগনে দেখা দিল। যে জ্ঞানালোক তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন ভারতের চিন্তনে, মননে ও অনুধ্যানে— তা আজও প্রদীপ্ত। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে,

'কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ
জ্বালিয়ে
তুমি ধরায় আস'।

ঠিক সেই রকমই ভারতের সর্বত্র আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত হয় এই প্রতিধ্বনি—

'ইত্থং শঙ্করমূর্তিনা ভগবতা
বাগ্‌দেবতা সিন্ধুনা'।

আচার্য শঙ্কর লোকশিক্ষক। তিনি জগদ্‌গুরু। জগৎকে শিক্ষা দিতে এসেছিলেন। সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তাঁর পদতলে এসে উপনীত হয়েছিল। কেরলের একটি ছোট্ট নদী 'আলোয়াই'। এরই তীরে 'কালাডি' গ্রাম। এই গ্রাম দেশের সামগ্রিকতার নিরিখে এতদিন অখ্যাত থাকলেও এবার তা স্থান করে নিল ইতিহাসের

পাতায়। শিবাবতারের আবির্ভাবক্ষেত্র হিসেবে। অখ্যাত কালাডি পরিণতি হলো পুণ্য তীর্থভূমিতে। ভবিষ্যতে এই কালাডি গ্রাম থেকেই শুরু হবে দিগ্বিজয়ী শঙ্করাচার্যের দিগ্বিজয়যাত্রা। কালাডি তাই ঈশ্বর-নির্দিষ্ট এক পরম পবিত্র স্থান। শঙ্কর যে অসামান্য পুরুষ, তার প্রমাণ রয়েছে তাঁর প্রতিটি কাজেই। তিনি তো এসেছিলেন ব্রহ্মবাদ প্রচারে, বেদের মর্মার্থ, সন্ন্যাসীর আদর্শ ও ত্যাগের মহিমার কথা জানাতে। তাই জন্ম থেকেই তিনি ত্যাগী, তিনি যতি। জগৎকে তিনি ত্যাগ শেখাবেন। শেখাবেন বন্ধনমুক্তির কথা। বলবেন পরামার্থ লাভের সহজ পথের কথা। তাই তিনি নিজে কীভাবে কোনোরকম বন্ধনে আবদ্ধ হবেন! তিনি তো জন্মমুহূর্ত থেকেই সন্ন্যাসী। এই সন্ন্যাসের প্রকৃত স্বরূপই তো তিনি ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'কৌপীন-পঞ্চকম্' স্তোত্রে।

'বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নামাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃ করণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।।
ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো, ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ।।

ব্রহ্মবিদ্ পুরুষকে আর জন্মচক্রের আবর্তনে আবর্তিত হতে হয় না। পাবন মন্ত্রস্বরূপ ব্রহ্ম অক্ষর যাঁরা নিয়তই উচ্চারণ করেন, যাঁরা নিজেদের ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করেন ও যাঁরা ভিক্ষালব্ধ আহার্যেই পরিতৃপ্ত, একমাত্র সেইসব কৌপীনধারী ব্যক্তিরাই এই পৃথিবীতে ভাগ্যবান। আশৈশব শঙ্কর এই মদাদর্শেরই ধারক ও বাহক। তাহলে আর বাহ্যিক সন্ন্যাসের প্রয়োজন কোথায়!

প্রয়োজন ছিল একটাই কারণে। যিনি জগৎকে লোকশিক্ষা দিতে এসেছেন, জগতের মানুষের প্রয়োজনকে তিনি উপেক্ষা করবেন কীভাবে! অবতারের জীবনকথাই তো ভবিষ্যৎকালের জন্য দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে থাকবে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে শঙ্করের উপনয়ন অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণত আট বছর বয়স না হলে উপনয়ন হয় না। তবে তিনি তো সাক্ষৎ শিব, তাই এক্ষেত্রে ব্যতিক্রমই হলো। কালের নিয়মে শঙ্কর সন্ন্যাসী হলেন মাত্র আট বছর বয়সে। তার আগে এই ব্যতিক্রমী ঘটনাটি যেন মুখবন্ধ। বালক সন্ন্যাসী শঙ্কর। কিন্তু তাঁকে সন্ন্যাস দীক্ষা দিলেন কে! এখানেও আরেক আশ্চর্য ব্যাপার, শঙ্কর নিজেই নিজেকে সন্ন্যাস দান করলেন। জগতের ইতিহাসে এ এক বিরল ঘটনা। স্বয়ং শঙ্কর এসেছেন ধরাধামে। তাঁকে সন্ন্যাস দীক্ষা দেওয়ার ক্ষেত্রে উপযুক্ত তিনি স্বয়ং ছাড়া আর কেই-বা থাকতে পারেন।

অষ্টমবর্ষীয় বালক এখন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী। এবার শুরু হলো তাঁর জয়যাত্রা।

শঙ্করাচার্য মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সারা ভারতের অধ্যাত্মজগতে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন, তার রেশ আজও থেকে গেছে। যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা তিনি রেখে গিয়েছিলেন, যুগ যুগ ধরে তা হিন্দুধর্মকে রক্ষা করবে— পথ দেখাবে।

পিছনে পড়ে রইল তাঁর জন্মস্থান কালাডি। বহুদেশ ঘুরে শঙ্কর এলেন নর্মদা তীরে। এখানেই সাক্ষাৎ হলো দুই মহাপুরুষের। প্রথমজন মহাযোগী গোবিন্দপাদ (প্রকৃতপক্ষে যিনি স্বয়ং মহর্ষি পতঞ্জলি) এবং দ্বিতীয়জন অবশ্যই শঙ্কর। শঙ্কর শিষ্যত্ব নিলেন গোবিন্দপাদের কাছে। মাত্র কয়েক বছরের অনায়াস সাধনাতেই শঙ্কর যোগের সবকটি ধারাতেই সিদ্ধি লাভ করলেন। এরপর এল সেইদিন। শঙ্করের প্রকৃত পরিচয় সেইদিনই সকলে উপলব্ধি করলেন। তখন বর্ষাকাল। কয়েকদিনের মুষলধারা বৃষ্টিতে নর্মদার জল ক্রমেই বেড়ে উঠল। দেখা দিল বন্যা। বন্যার জল বাড়তে বাড়তে এক সময় গোবিন্দপাদের গুহাকক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে আর কি! সকলেই চিন্তিত। শঙ্কর সকলকে আশ্বস্ত করে গুহার সামনে একটি কুম্ভ স্থাপন করে বললেন, 'আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন। বন্যার জল গুরুদেবের গুহাকক্ষে প্রবেশ করতে পারবে না'। সকলকে অবাক করে এরপর বন্যার জল সেই কুম্ভের মধ্যেই ঢুকতে লাগল। আর অগ্রসর হলো না। এক সময় ধীরে ধীরে নদীর জলও নেমে গেল। গুরু গোবিন্দপাদ শিষ্যের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা শুনে বললেন, 'এ তো পূর্ব নির্ধারিতই। শঙ্কর তো আর কেউ নয়। স্বয়ং কৈলাসপতি। ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রের অনেকগুলি ব্যাখ্যা রয়েছে। তবে সেগুলি পরস্পর বিরোধী। এই সব ব্যাপারে চিন্তিত হয়ে প্রাচীনকালে দেবগণ কৈলাসে শিবের কাছে প্রতিকার প্রার্থনা করেছিলেন। উত্তরে শিব বলেন যে, এই দুঃসাধ্য কাজের উপযুক্ত অধিকারী একজনই। যে ব্যক্তি উত্তাল নদীর স্রোতকে একটি কুম্ভের মধ্যে ধারণ করার ক্ষমতা রাখেন, তিনিই পারবেন বেদের যথার্থ মহিমা অক্ষুণ্ণ রাখতে এবং পরস্পর বিরোধী সমস্ত মত ও পন্থাকে একত্র করতে। দেবগণ এরপর কৈলাসপতিকে অনুরোধ করলেন এই কার্যের জন্য মর্ত্যলোকে অবতীর্ণ হতে। কারণ, এ কাজ তো স্বয়ং শঙ্কর ব্যতীত দ্বিতীয় কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

গোবিন্দপাদ শিষ্যকে আশীর্বাদ করে বললেন এই পৌরাণিক কাহিনি। ব্যাসদেবের ব্রহ্মসূত্রের বেদান্তভাষ্য রচনার কাজে অগ্রসর হওয়ার জন্য শঙ্করকে নির্দেশ দিলেন তিনি। আগামী দিনের ভারতবর্ষে বেদান্তচর্চার এই হবে আকর ও পথপ্রদর্শক। গোবিন্দপাদের কাজ শেষ হয়েছে। তাই তিনি একদিন যোগবলে দেহত্যাগ করলেন। একটি যুগের পরিসমাপ্তি ঘটল। শুরু হলো শঙ্করাচার্যের জীবনের নতুন অধ্যায়।

এখন থেকে শঙ্কর আর শুধুমাত্র আচার্য নন, তিনি একাধারে ধর্মপ্রচারক আবার অন্যদিকে যথার্থ ধর্মসংস্থাপকও বটে। এবার শুরু হলো শঙ্করাচার্যের ভারত পরিক্রমা। বহুদেশ ঘুরে, বহু তীর্থ দর্শন করে আচার্য

শিষ্যদের নিয়ে এসে পৌঁছলেন কাশীতে। কাশীধামে বাবা বিশ্বনাথের নির্দেশের কথা তো আগেই বলেছি। এবার হরিদ্বার হয়ে শঙ্কর এলেন বদরিকাশ্রমে। বারো বছর বয়সের এক বালক সন্ন্যাসীর শিষ্য হয়ে সঙ্গে সঙ্গে এলেন কিশোর থেকে যুবক, প্রৌঢ় থেকে বৃদ্ধ— কত পণ্ডিত, কত সাধক, কত মহাত্মারা। বদরীক্ষেত্রে প্রভু নারায়ণের মন্দিরে সুপ্রাচীন পৌরাণিককালের বিগ্রহটি উদ্ধার করে মন্দিরে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলেন আচার্য। আচার্যের জয়ধ্বনিতে সমস্ত হিমালয়ক্ষেত্র তখন মুখরিত। শঙ্কর কিন্তু এইসবে একেবারেই অবিচল। বদরিকাশ্রম থেকে ব্যাসতীর্থ ব্যাসাশ্রম। এইখানেই রচিত হয়েছিল মহাভারত। কত যুগ পরে অবতার শঙ্করাচার্য এখানেই শুরু করলেন ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনার কাজ। চার বছরে কাজ শেষ হলো। আচার্যের একটি কাজ তো সম্পূর্ণ হলো, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তাঁর আবির্ভাব, তা তো এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। এবার ভারতের বিভিন্ন ধর্মমতকে একত্র করার সেই দুঃসাধ্য কর্মযজ্ঞের গোড়াপত্তন হলো। এই যজ্ঞের হোতা স্বয়ং আচার্য শঙ্কর। হিমালয়ের গিরিকন্দর থেকে এবার শুরু হলো তাঁর ভারত বিজয়। ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম— সর্বত্র অদ্বৈতবাদ সুপ্রতিষ্ঠিত হলো। তবে এই কাজ যতটা সহজে বলা হলো, তেমন সহজ মোটেই ছিল না। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনার পর শঙ্কর দেহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এই সময় স্বয়ং ব্যাসদেব শঙ্করকে তখনি দেহত্যাগে নিষেধ করেন ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী পণ্ডিত সমাজকে বিচারে পরাজিত করে বেদের মহিমা পুনরুদ্ধারের কাজে ব্রতী হওয়ার জন্য নির্দেশ দেন। এই মহান কাজে শঙ্করকে বহু ক্ষেত্রে বহু বাধার সম্মুখীনও হতে হয়েছে, এমনকী তাঁর প্রাণ সংশয়ও দেখা দিয়েছে বহুবার। কিন্তু আচার্য সবক্ষেত্রেই অচল, অটল ও নির্বিকার। তিনি যে শঙ্কর। হিন্দুধর্মের রক্ষক তিনি। ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে আসবেন কত সাধু, মহাত্মা ও মহাপুরুষেরা। কিন্তু তাঁরা আসার আগে ধর্মের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করে গেলেন শঙ্করাচার্য। ধীরে ধীরে সারা ভারতবর্ষের জনপ্রিয়তম ব্যক্তিত্বে পরিণত হলেন শঙ্করাচার্য। সারা দেশে অদ্বৈতের ভিত্তি হলো সুপ্রতিষ্ঠিত। শুধুমাত্র দুটি মধুর কথা শুনে সকলেই শিষ্যত্ব গ্রহণ করছেন শঙ্করের। ইতোমধ্যে শঙ্করের শিষ্যমণ্ডলীতে এসে উপস্থিত হয়েছেন সনন্দন (যিনি পরবর্তীকালে পদ্মপাদ নামে প্রসিদ্ধ হবেন) তোটকাচার্য, সুরেশ্বরাচার্য, হস্তামলক প্রমুখ প্রধানতম শিষ্যেরা।

শঙ্করের ভারত বিজয় তো সম্পূর্ণ হলো। কিন্তু সনাতন হিন্দুধর্মকে কোন বাঁধনে তিনি বাঁধলেন! সেই বাঁধন আত্মজ্ঞানের। তার ভিত্তি বেদ-বেদান্ত। তার বোধ এক ও একমাত্র অদ্বৈতবোধ। নিজেকে চেনা, নিজেকে জানার কথাই বলা আছে বেদান্তে। আত্মজ্ঞান হলে নিজেকে উপলব্ধি করা যায়। 'অবাঙ্মনসগোচরম্' — সেই ব্রহ্মকে বোধে বোধ করা যায়। এই তো ব্রহ্মজ্ঞানের মূল কথা। বহু ভাগ্যের ধন এই মনুষ্যদেহ। তাকে হেলায় নষ্ট করো না। মানুষ হয়ে জন্মে মুমুক্ষু হতে চেষ্টা কর। অনিত্য বস্তু থেকে নিত্য সেই ব্রহ্মপদের অভিলাষী হতে প্রয়াসী হও। সৃষ্টি হলো 'মোহমুদ্গর' স্তোত্র। সদসৎ বিচার কর। এরই নাম বিবেক। শঙ্করাচার্যের সমগ্র স্তোত্রাবলী যেন ভারতের ধর্মজগতে একটা আলোড়ন। যুগ যুগ ধরে সনাতন ধর্মের উপরে জমে থাকা মলিনতা, পঙ্কিলতা আর ধর্মের নামে অধর্মকে এক লহমায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বহুকাল পরে এই বাঙ্গলায় শ্রীরামকৃষ্ণ বলবেন, মানুষ থেকে মান-হুঁশ হবার কথা। কারণ, তখনি আমাদের আমি— আমি কলরবটা থেমে যায়। আমার আমিত্ব আর অহং-এর দরজা খুলে হৃদয়-আকাশে জ্ঞানসূর্যের দীপ্তির পূর্ণ প্রকাশ ঘটে। জীবত্ব থেকে শিবত্বে উত্তরণ ঘটে তখন। 'যত্র জীব, তত্র শিব'— একথার প্রকৃত অর্থ তখনই বোঝা যায়। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা; এ তো কেবলমাত্র কথার কথা নয়। জীবনের মূল সত্যে উপনীত হতে গেলে চাই— চারটি অস্ত্র। জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক এবং বৈরাগ্য। শুনতে চারটি আলাদা শব্দ হলেও একটি ছাড়া অন্যটি লাভ হয় না। যথার্থ বৈরাগ্যবান পুরুষ মাত্রেই জ্ঞানী। তিনি জানেন যে, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলের মধ্যেই সেই একই অখণ্ড, অব্যয় আত্মা বিরাজমান। তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'।

তিনি সমস্ত কর্তব্য-কর্ম করেন কিন্তু কোনো কিছুতেই তাঁর কোনো রকম আসক্তি থাকে না। তাই সমস্ত কিছুর আগে চাই নিজেকে জানা ও নিজেকে চেনা। তুমি সেই বিশুদ্ধ আত্মা। তুমি অবিনশ্বর। তুমি সততই আনন্দময়. আনন্দই তোমার স্বরূপ। জীব মাত্রই ঈশ্বরের সঙ্গে স্বরূপতঃ এক। জীব মাত্রই তাই সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরেরই এক-একটি রূপ। বুদ্ধ পরবর্তী যুগে যে অনাচার, ভ্রষ্টাচার হিন্দুধর্মকে গ্রাস করছিল, শঙ্কর এসে তার বিনাশ করলেন। হিন্দুধর্মের অস্তিত্বই বিপন্ন হয়ে পড়েছিল। শঙ্করের আগমনে সনাতন হিন্দুধর্ম ফিরে পেল হৃত গৌরব। অবহেলিত হিন্দুতীর্থগুলি স্বমহিমায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সারা দেশে বেদবিদ্যাচর্চা, বৈদিক ধর্ম অনুশীলন ও ঋষিদের শেখানো পথে সাধনার সূত্রপাত হলো। শঙ্কর কঠোর বৈদান্তিক হলেও অধিকারী বিচার করে উপদেশ দিতেন। তিনি গৃহস্থদের সকলকেই সন্ন্যাসী হয়ে যেতে বলেননি কখনোও। গৃহীদের প্রতি শঙ্করের নির্দেশ ছিল পঞ্চদেবতার পূজা ও পঞ্চমহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান।

হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করতে শঙ্কর তৈরি করলেন এক শক্তিশালী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়। ভারতের চারপ্রান্তে তৈরি হলো চারটি মঠ।

শঙ্করের পূর্বনির্ধারিত সব কাজই এবার সম্পূর্ণ। কেদারনাথের তুষারাবৃত গুরুগম্ভীর পরিবেশে শঙ্করাচার্য স্ব-স্বরূপে বিলীন হলেন। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সারা ভারতের অধ্যাত্মজগতে যে আলোড়ন তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, তার রেশ আজও থেকে গেছে। যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা তিনি রেখে গিয়েছিলেন, যুগ যুগ ধরে তা হিন্দুধর্মকে রক্ষা করবে— পথ দেখাবে।

শ্রুতিস্মৃতিপুরাণানামলিয়ং করুণাময়ম্।
নমামি ভগবৎপাদং শঙ্করং লোকশঙ্করম্।।

■

মহিয়সী সীতা

অশোক দাস

মধ্যযুগে পারিপার্শ্বিক কারণেই ভারতবর্ষে নারীসমাজ ছিল অন্ধকারে। কিন্তু বৈদিকযুগে নারীরা স্বমহিমায় উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত ছিলেন। এই সময় তারা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ায় ভারতবর্ষে ঘটেছিল গৌরবময় সুবর্ণযুগ। সেই ইতিহাস আজ বিস্মৃতির অতল তলে। এখন আমাদের মনে বিস্ময় জাগে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, শিল্পে-সাহিত্যে, ধর্মে-দর্শনে উন্নত একটা জাতি কয়েক শত বছর পরে কীভাবে ঘোর অন্ধকারে নেমে এল? অসংখ্য গবেষক এনিয়ে গবেষণা করেছেন।

ভারতবর্ষের প্রথম ইতিহাসটি লিখিত আকারে দেখতে পাওয়া যায় মহামুনি বাল্মীকির রচনা রামায়ণের মধ্যে। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর মতো আদর্শ চরিত্র পৃথিবীর ইতিহাসে আর নেই। হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হলেও শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবীর সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, স্বর্গীয় প্রেমের মাধুর্য, সুশাসন পৃথিবীতে বিরল। অনেকের মনে প্রশ্ন জাগে, মহামুনি কোথা থেকে এই ঘটনা জেনেছেন? কেন তিনি রামায়ণ লিখতে গেলেন? মূল প্রেরণা কোথা থেকে কীভাবে পেয়েছিলেন; তা তিনি লিপিবদ্ধ করে যাননি। রামায়ণ রচনা করতে করতে রাবণ বধ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করেছেন এমন সময় হঠাৎ তিনি দেহত্যাগ করেন। তিনি গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন ‘পৌলস্তবধ’ যার বাংলা অর্থ অসুর নিধন। তিনি নিজের জীবনের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করে যাননি। তিনি যখন রামায়ণ রচনা করেন তখন শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষা ছিল না, পণ্ডিত পানিনি ভাষার শুদ্ধ রূপ দেন। পরবর্তীকালে অযোধ্যার বিখ্যাত পণ্ডিত অশ্বঘোষের অনুপ্রেরণায় মহাকবি কালিদাস শ্রীরামচন্দ্রের পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বংশধরদের জীবন কাহিনি ‘রঘুবংশের’ মাধ্যমে শুদ্ধ সংস্কৃতভাষায় রচনা করেন। মহামুনি বাল্মীকির লেখা রামায়ণের সঙ্গে মহাকবি কালিদাসের রাম-সীতার ঘটনাবলীর যেমন বহু মিল রয়েছে, তেমনি বহু জায়গায় অমিল দেখা যায়। কিন্তু কেন? রামায়ণের মূল স্রষ্ঠা হলেন ঋষি জনক। অক্রমুনি ও কুশধ্বজের বিশেষ কোনো উল্লেখ যেমন নেই, তেমনই লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন এদের বিশেষ কর্মকাণ্ড অবলুপ্ত। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে শ্রীরামচন্দ্রের সুযোগ্য পুত্র লব ও কুশের সীতাদেবীর শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ওঠা এবং তাদের শাসনে প্রজাগণের সুখে-শান্তিতে বসবাস করার কথা লিখেছেন। লব ও কুশের রাজ্য শত শত বছর অটুট ছিল— যা পৃথিবীর ইতিহাসও বিরল।

প্রাচীনকালে বেদের পঠন পাঠনের পদ্ধতি ছিল সাহিত্যের মাধ্যমে। সাহিত্যে মানুষের হৃদয় মন যেমন আনন্দে আপ্লুত হয়, গভীর বেদনায় হয় ভারাক্রান্ত, মানুষের মধ্যে মানুষের মহামিলনের স্থান করে নেয়, তা ইতিহসে সম্ভব নয়। তাই প্রাচীন পণ্ডিতগণ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন ছন্দের ভাষায় সাহিত্যের মাধ্যমে। প্রতিভা কখনো শিক্ষা ব্যাতিরেকে বিকাশ লাভ করতে পারে না। তেমনি জ্ঞানী সৎ সাহসী পণ্ডিত ব্যাতিরেকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ লাভ করা অসম্ভব। প্রাচীন ভারতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পণ্ডিত ছিলেন মিথি। তাঁর নামানুসারে রাজ্যটির নামকরণ হয় মিথিলা। তাঁরই প্রচেষ্টায় এখানে গড়ে উঠেছিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মিথিলা বিশ্ববিদ্যালয়। মিথিলার বিশ্ববিদ্যালয়টি নেপালের অন্তর্গত হওয়ায় স্বাধীন ভারতে স্থানান্তরিত হয় দ্বারভাঙা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগে। যতদূর সম্ভব জানা গেছে তিন হাজার থেকে চার হাজার খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতবর্ষে যুদ্ধের তাণ্ডবলীলায় হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত হয় তিনটি যুদ্ধে। শ্রীলঙ্কায় রাবণের সঙ্গে রামচন্দ্রের, কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবের সঙ্গে কৌরবদের, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বীরাঙ্গনা দুর্গাদেবী মহিষাসুরকে হত্যা করেন বিহারের রাজগির পাহাড়ে। এই তিনটি যুদ্ধের গোপন পরামর্শ হয়েছিল ঋষি জনকের আলয়ে। ঋষি জনকের নির্দেশে ঘটনাগুলি প্রচারের আলোয় আলোকিত হয়নি। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রাচীন তথ্যগুলি আলোকিত হোক। কিন্তু তিনি এ কাজে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বর্তমান বিহার রাজ্যের মধুবনী জেলায় সীতামহী গ্রামে নির্মিত হয়েছে জানকী মন্দির। প্রাচীন ভারতবর্ষে এখানে ছিল ঋষি জনকের মধ্যম ভ্রাতা অক্রমুনির

আশ্রম। চতুর্দিকে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত ফল ও ফুলের বাগান। কুলুকুলু ধ্বনিতে প্রবাহিত গঙ্গার শাখানদী কমলা। চতুর্দিকে বিশাল আম্রকনন, শাখায় শাখায় সুবিশাল মধুচক্র। ভোরের আকাশে ভেসে আসত সুমধুর গুঞ্জন ধ্বনি। তাই এই জায়গাটির নামকরণ হয়েছিল মধুবনী। ঈশ্বরের সৃষ্টির রহস্যের সন্ধানে অরণ্যের সুশীতল ছায়ায় সাধনায় বসতেন অক্রমুনি। এখানকার অরণ্যচারী ছোটো ছোটো মানবগোষ্ঠী তখন কৃষিকাজ জানত না, আগুনের ব্যবহার শেখেনি। অরণ্যের কাঁচা ফলমূল, পশুপাখি জন্তুজানোয়ার মেরে ভক্ষণ করত। তাই তিনি এখানকার মানুষজনকে বেদমন্ত্রে দীক্ষা দানে, পুত্র স্নেহে ভালোবাসার বন্ধনে বেঁধেছিলেন সবাইকে। আশ্রমের কর্মকাণ্ডে আকৃষ্ট হয়ে শত শত নরনারী দলে দলে সকাল সন্ধ্যায় আসতেন এখানে। তাই সোনার ফসলে সকলের গৃহে গৃহে আনন্দের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। চাষবাস পশুপালনে সমৃদ্ধি লাভ করায় সুস্থ সবল সমাজ গড়ে উঠতে লাগল। হঠাৎ একসময় এখানে ঘটে গেল প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পর পর তিন বছর অনাবৃষ্টি হওয়ায় জলের অভাবে গাছপালা শুকিয়ে যেতে থাকল। দেখা দিল মহামারী। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল দুর্গন্ধ। হঠাৎ একদিন আশ্রমের পার্শ্বে পল্লীতে আনন্দের শঙ্খধ্বনির মধ্যে জন্ম হলো এক অপরূপা সুন্দরী কন্যার। সকলেই ভাবলেন আমাদের কাতর আর্তনাদ শুনে স্বর্গের দেবতারা পাঠিয়েছেন মা লক্ষ্মীকে। নবজাত শিশুর নাম রাখলেন লক্ষ্মী। পিতৃবিয়োগের কয়েক মাস পরে লক্ষ্মীর মা চলে গেলেন স্বর্গে। লক্ষ্মীর কান্না শুনে মুনির হৃদয় মন ভারাক্রান্ত হলো। এখান থেকে প্রায় আশি কিলোমিটার উত্তরে রাজর্ষি জনকের রাজপ্রাসাদে অক্রমুনি গিয়ে বললেন, দাদা! আমার এই দুর্দিনে আপনি ছাড়া আমার আর কে আছে? আমার এই সমস্যার কি কোনো সমাধানের উপায় নেই?

পরদিন ডাকা হলো রাজসভা। সমস্ত পণ্ডিতগণ একমত হলেন— ইন্দ্রদেবতার পুজো করতে হবে। যদি দেশের রাজা লাঙ্গল ধারণ করেন তবে বৃষ্টি অনিবার্য। পরদিন প্রভাতে অক্রমুনির আশ্রমে চলল ইন্দ্র দেবতার পূজা। সাতদিন পর ঋষি জনক ব্রাহ্মমুহূর্তে বেদি থেকে লাঙ্গল নিয়ে পূর্ব মুখে ইন্দ্র দেবতার প্রার্থনা করতে করতে এগিয়ে চলেছেন। এমন সময় লক্ষ্মীর আত্মীয়া মামিমা, কাকিমা, পিসিমা প্রভৃতি পাঁচজন মহিলা সুন্দর ফুলচন্দনে একটি তাম্রপাত্রে লক্ষ্মীকে সাজিয়ে লাঙ্গলের রেখাটির উপর রেখেছেন। ওই পাঁচজন মহিলা আম্রকাননে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখছেন ঘটনা কী ঘটে? আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ঋষি মন্ত্র জপ করতে করতে লাঙ্গল নিয়ে ভূমি কর্ষণ করে চলেছেন। চতুর্দিকে আকাশ কাঁপানো বাদ্যধ্বনি। তাম্রপাত্রে লাঙ্গলের ফলাটি লেগে শিশুটি পড়ে যায়। ভূমিকর্ষণের সময়ে মাঠে যে রেখাটি দেখা যায় তাকে বলা হয় সীতা। চতুর্দিক থেকে পণ্ডিতগণ ঋষির উদ্দেশ্যে চিৎকার করে বলে উঠলেন— সীতা, সীতা, সীতা। জনক পণ্ডিত ঋষিকে বললেন, ঋষি আপনি সীতার দিকে তাকান। ঋষি পণ্ডিতদের চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখলেন ছোটো একটি শিশু ধুলায় লুণ্ঠিত হয়ে কাঁদছে। ঋষি জনক শিশুটিকে নিজ বস্ত্রে পরিষ্কার করে কোলে নিলেন, তখন শিশুটি আনন্দে হাসছে। এমন সময় আম্রকানন থেকে পাঁচজন মহিলা এসে বললেন ঋষি এই শিশুটি পিতৃ-মাতৃহীন। অক্রমুনির শিষ্য এক কৃষক পরিবারে এর জন্ম। ঋষি বললেন, তোমরা আমাকে এই শিশুটি দাও, আমি নিজ কন্যার ন্যায় লালনপালন করব। দেখতে দেখতে উত্তর আকাশে দেখা দিল ঘন কালো মেঘ। প্রবল ঝড়-বৃষ্টি। অন্ধকারে ঢেকে গেল মধুবনী। গাছপালা পশুপাখি যেন ফিরে পেল নতুন প্রাণ। তাই এখানকার পণ্ডিতগণ এই শিশুর জন্মদিনটিতে আরাধনা করে থাকেন লক্ষ্মীর। পণ্ডিতগণ শিশুটির নামকরণ করলেন সীতা। কয়েকদিন পরে পাঁচজন মহিলা সীতাকে নিয়ে পৌঁছলেন ঋষি জনকের আশ্রমে। সীতার অপূর্ব রূপ-লাবণ্যে আপ্লুত হয়ে ঋষি জনক নিজ কন্যারূপে গ্রহণ করায় সীতার নামকরণ হলো জানকী। সীতার আত্মীয়দের ডেকে ঋষি বললেন— আমার একটি শর্ত আছে। কখনো কোনোদিন তোমরা তোমাদের পরিচয় প্রকাশ করবে না। সীতাদেবীকে দেখার জন্য চতুষ্পার্শ্বের মানুষজন আসতে থাকলেন। পল্লীর নর-নারীদের সেবাযত্নে বড়ো হতে থাকলেন সীতাদেবী। এখানকার বিদ্যার্থদের জন্য গড়ে উঠেছিল শিক্ষানিকেতন। মহারাজা মিথি নারীদেরও সুশিক্ষার প্রচলন করেছিলেন। কারণ নারীরা জ্ঞানের আলোকে আলোকিত না হলে সুস্থ সবল সমাজ গড়ে উঠবে না। প্রতিটি রাজবাড়িতে যারা পুজো পার্বণ এবং গুরুকুল ও আশ্রমিক শিক্ষা নিকেতনগুলি পরিচালনা করতেন তাদের বলা হতো দেব। যেমন— চৌষট্টিজন পণ্ডিতকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'ব্যাসদেব'। এইরূপ চৌষট্টিজন ব্যাসদেবের প্রধান ছিলেন 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস'। এই চৌষট্টিজন বেদব্যাসের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে মহাভারত লেখা হয়েছে। মহামুনি বাল্মীকি একাই লিখেছিলেন রামায়ণ। প্রাচীন ভারতবর্ষের শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন জানকী মন্দির। যেন এটি একটি পাথর দিয়ে নির্মিত। বর্তমান যুগের বৈজ্ঞানিকরা বিস্মিত হন মন্দিরটি দেখে। পৃথিবী শ্রেষ্ঠ জার্মান বৈজ্ঞানিকরা মন্দিরটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে জানিয়েছেন, এটি মিশরের পাথর দিয়ে তৈরি। এখনকার দিনে কোনো বৈজ্ঞানিকের পক্ষে এমন বাড়ি তৈরি করা অসম্ভব। সন্ধ্যার জ্যোৎস্নার আলোকে মন্দির থেকে এমন এক আলোকরশ্মি নির্ঝরিত হয় যেন স্বর্গ থেকে দেবদূতরা এই মন্দিরে নেমে আসছেন। এখানে বারোমাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকত। পণ্ডিতদের তর্কযুদ্ধ, নৃত্যকলায়, গানে মুনিঋষিদের বেদমন্ত্রে হাজার হাজার মানুষের ঢল নামত। প্রতি বছর সারা ভারতবর্ষের রাজা, রাজপণ্ডিতদের সম্মানিত করা হতো। ঋষি জনক একবার মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। জম্বুদ্বীপের যিনি সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী পুরুষ বলে প্রমাণিত হবেন তাঁকে একলক্ষ গাভী ও দশলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করা হবে। সারা ভারতবর্ষের বহু রাজা, বহু পণ্ডিত মুনি ঋষি উপস্থিত হয়েছিলেন। অনেকেই এসেছিলেন তর্কযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্যে, অনেকে এসেছিলেন তর্কযুদ্ধ দেখার জন্য। জনকের অন্তরঙ্গ রাজা দশরথ ও তাঁর রাজন্যবর্গ, কুলপুরোহিত বাল্মীকি, পাঞ্চাল রাজা ও রাজপণ্ডিত এই তর্কযুদ্ধে জ্ঞানের পরীক্ষা নেওয়ার জন্য

নিযুক্ত হয়েছিলেন। উপস্থিত ছিলেন জ্ঞানী ব্রহ্মবাদিনী বচকুর কন্যা গার্গী। প্রধান অতিথি ছিলেন হরপার্বতী এবং প্রধান বিচারক ছিলেন কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস। বহু পণ্ডিত, মুনি-ঋষি গার্গীর সঙ্গে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হলেন। তখন সিংহের ন্যায় গর্জন করে গার্গীকে ধিক্কার জানালেন ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। তিনি বললেন— গার্গী! তুমি মুনি-ঋষিদের অতি বাচালের ন্যায় প্রশ্ন করছ— আর বেশি বাচালতা করলে মস্তক ধুলায় লুণ্ঠিত হবে! সভা নিস্তব্ধ! গার্গী বললেন— আমার দুই হাতে দুটি তির রয়েছে। প্রত্যেক তিরে পাঁচটি ফলা। আমি ভয়ে পিছিয়ে যাওয়ার নারী নই। তিনি সভায় দশটি প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিলেন। যিনি এই দশটি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দানে সক্ষম হবেন তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ঋষি বলেই জ্ঞাত হবেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য উঠে দাঁড়ালেন, বললেন— দশটি প্রশ্নের উত্তর। গার্গী বললেন— হ্যাঁ, আপনার কয়েকটি উত্তর সঠিক। যেগুলি ভুল করেছেন তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, গার্গী, এই সভায় দাঁড়িয়ে সমস্ত পণ্ডিত ও আপনার কাছে আমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। গার্গী বললেন, আপনি আমার পিতৃতুল্য। আপনাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। এই সভায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হরনাথ। আমি ঘোষণা করছি এই সভায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ঋষি যাগ্যবল্ক। হরনাথ দাঁড়িয়ে বললেন— ঋষি, আপনি ঋষি জনকের দেওয়া গাভীগুলি পুরস্কার হিসেবে গ্রহণ করুন। আজ আমি এই সভায় ঘোষণা করছি— (ঋষি জনকের পার্শ্বে বসেছিলেন সীতা) ঋষি জনকের কন্যা সীতার রূপগুণ আচার আচরণে মুগ্ধ হয়ে আমি আমার এই 'হরধনু' এখানে রেখে যাচ্ছি। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বীর যোদ্ধা ও জ্ঞানী পুরুষ ছাড়া এই ধনুতে গুণ পরাবার ক্ষমতা কারুর নেই। যিনি এই ধনুতে গুণ পরাতে পারবেন তাঁর সঙ্গে সীতার বিবাহ হবে।

ভারতবর্ষের বহু রাজা, বহু বীর যোদ্ধা এই ধনুতে গুণ পরাতে ব্যর্থ হয়। সর্বশেষে রাজা দশরথের পুত্র রামচন্দ্র এই হরধনুতে গুণ পরাতে সমর্থ হওয়ায় শ্রীরামচন্দ্রের সঙ্গে সীতাদেবীর বিবাহ অনুষ্ঠান সুচিত হয়। ঋষি জনকের অপর কন্যা ঊর্মিলার সঙ্গে লক্ষ্মণের, ঋষি জনকের ছোটো ভাই কুশধ্বজের দুই মেয়ে মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্তির সঙ্গে ভরত ও শত্রুঘ্নের বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

শত শত বছর ধরে সাকেত (অযোধ্যা)-এর সঙ্গে মিথিলার রাজবংশের সুমধুর সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হলো। অনাদিকাল হতে আজও মানব জাতির সম্পদ, রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা, আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, সংগীত-কাব্য-সাহিত্য-বিজ্ঞান ভারতবর্ষে স্বর্ণময় যুগের সৃষ্টি করেছে। কালক্রমে কেন তা ধ্বংস হলো তা এখন আলোচ্য বিষয়। আশা করা যায়, আবার ভারতবর্ষের মানুষ সুশিক্ষায় শিক্ষিত হবে। ফিরে আসবে স্বর্ণযুগ। □

শোকসংবদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী বিভাগ প্রচারক আশিস মণ্ডল ও তাম্রলিপ্ত জেলা সহ-বৌদ্ধিক প্রমুখ কল্যাণ আশিসের পিতৃদেব সন্তোষ কুমার মণ্ডল গত ২২ নভেম্বর পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ভৈরবপুর গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, ১৯৯২ সালে এই মণ্ডল পরিবারকে কেন্দ্র করেই এলকায় সঙ্ঘকাজ শুরু হয়।

****

গত ২২ নভেম্বর মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক প্রণব দত্ত পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হযেছিল ৮৭ বছর। তিনি ৩ পুত্র রেখে গেছেন।

****

বাঁকুড়া নগরের প্রবীণ স্বয়ংসেবক অমিয়মধব চট্টোপাধ্যায় গত ২১ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৩ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তাঁর সব পুত্রই স্বয়ংসেবক।

****

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের বাঁকুড়া বিভাগের পূর্বতন বিভাগ সঙ্ঘচালক মিহির কুমার মুখোপাধ্যায় দীর্ঘদিন রোগভোগের পর গত ২৪ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ১ কন্যা,২ পুত্র ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি দক্ষিণবঙ্গের পূর্বতন প্রান্তপ্রচারক, অধুনা ক্ষেত্র সম্পর্ক প্রমুখ বিদ্যুৎ কুমার মুখোপাধ্যায়ের পিতৃদেব। তিনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। আদর্শবান শিক্ষক হিসেবে এলাকায় তাঁর পরিচিতি ছিল।

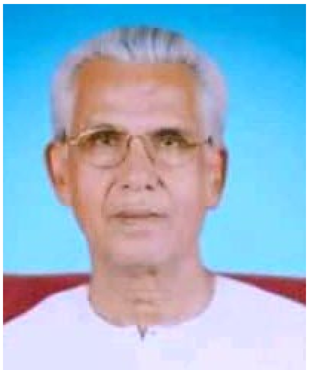

****

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্ত কার্যালয় প্রমুখ সন্দীপ সামন্তের (পিন্টু) পিতৃদেব সুবোধ কুমার সামন্ত গত ২৬ নভেম্বর বর্ধমান জেলার ভাতার খণ্ডের বলগনাচটি গ্রামের বাড়িতে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। তিনি ২ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মচারী ছিলেন। সেই সঙ্গে ২২ বছর ধরে অনুকূল ঠাকুরের সৎসঙ্গের ঋত্বিক ছিলেন।

শিশুকাল থেকেই শিশুদের দাঁতের যত্ন নিতে শেখাতে হবে

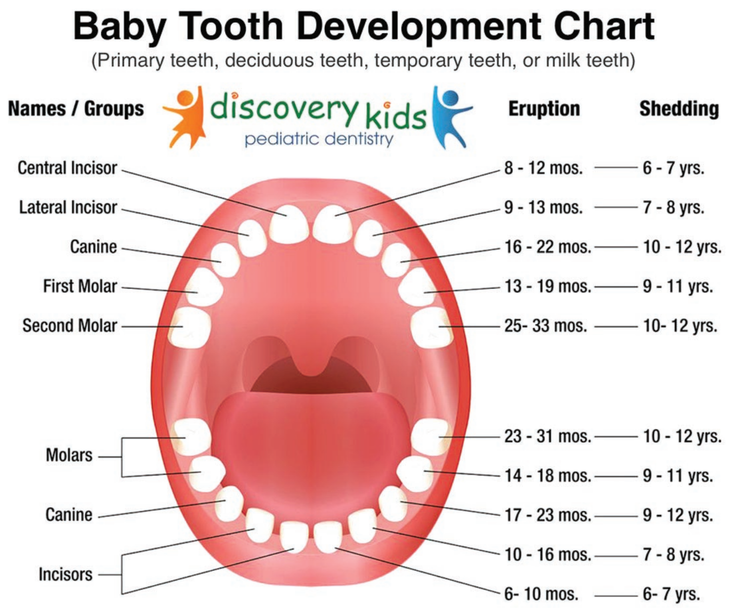

ডাঃ শঙ্কর ব্যানার্জী

একটি সুস্থ সুন্দর হাসির প্রধান পূর্বশর্ত হলো সুন্দর দাঁত। আমাদের আলোচ্য বিষয় শিশুদের দাঁত, যাকে আমরা ডাক্তারি ভাষায় Deciduous Tooth এবং সরল ভাষায় দুধদাঁত বলে থাকি।

শিশুদের দাঁত নিয়ে আলোচনার শুরুতেই বলে রাখা ভালো যে দুধ দাঁতের (যা ভেঙে গিয়ে পারমানেন্ট দাঁত আসে) সঙ্গে পারমানেন্ট (স্থায়ী) দাঁতের এবং মুখমণ্ডল সুন্দর হয়ে ওঠার গভীর সম্পর্ক আছে। তাই শিশুকালে দুধদাঁতের অযত্নের খেসারত বয়সকালে স্থায়ী দাঁতের কষ্টের মাধ্যমে না দেওয়াটাই কাম্য।

শিশুদের মোট দাঁতের সংখ্যা ২০টি। ৬ মাস বয়সে দাঁত বের হওয়া শুরু হয় এবং ৩ বছর পর্যন্ত সব দুধ দাঁত বের হয়। American Dental Association-এর মত অনুযায়ী দুধ দাঁত বেরোনোর এবং তা পড়ে যাওয়ার কারণ অনেকের অজানা, কিন্তু এটি জেনে রাখা অত্যন্ত জরুরি। এই সময়গুলো প্রত্যেকের ক্ষেত্রে এক হয় না।

দুধদাঁতের কার্যকারিতা :

১. স্বাভাবিক মুখের গঠন তৈরিতে।

২. কথা বলতে।

৩. খাবার ভালো করে খেতে।

৪. ক্ষয় ও সংক্রমণবিহীন স্থায়ী দাঁত গঠন করতে।

দাঁতের সব থেকে বাইরের স্তর Enamel যা আমাদের দেহের সবথেকে শক্তস্তর, সেটা দুধ দাঁতের ক্ষেত্রে তুলনামূলক পাতলা হয় যা দুধ দাঁতের ক্ষয় প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। দুটি দাঁতের মাঝের ফাঁক দুধ দাঁতের ক্ষেত্রে সাধারণ। কারণ এই ফাঁক স্থায়ী দাঁত বের হওয়ার জায়গা তৈরি করে। দাঁতের ক্ষয় শুরু হতে পারে প্রথম দাঁত আসার সঙ্গে সঙ্গেই। তাই প্রথম দাঁত ওঠার মুহূর্ত থেকে তার যত্ন করা উচিত।

১. দিনে দুবার ব্রাশ করা উচিত, সকালে ও রাতে শুতে যাওয়ার আগে।

২. Flossing-এর অভ্যাস শিশু বয়স থেকে শুরু করতে পারলেই ভালো হয়। কারণ দাঁতে ফাঁক থাকার কারণে এটি সহজ হয় যা পরে অভ্যাসে পরিণত হয়।

৩. দু' বছরের নীচের শিশু চালের দানার সাইজের পরিমাণ এবং ৩ থেকে ৬ বছরের শিশুর মটরদানার সাইজের পরিমাণের Fluoride যুক্ত toothpaste ব্যবহার করা উচিত।

৪. নরম কূর্চ (Soft Bristle) ব্রাশ দিয়ে ২ মিনিট ধরে দিনে দুবার এবং মিষ্টি জাতীয় জিনিস খাবার পর ব্রাশ করা উচিত।

৫. ছোট্ট থেকে শিশুদের ব্রাশ করার সঠিক পদ্ধতি শেখানো উচিত। ৪৫ ডিগ্রি কোণ করে খুব আস্তে দাঁতের সব দিকে ভালোভাবে ব্রাশ করা দরকার।

৬. ছয় বছর বয়স পর্যন্ত অভিভাবকদের উচিত শিশুদের ব্রাশ করানো।

শিশুদের দাঁতের মূল সমস্যা হলো দাঁতের ক্ষয় (Dental Caries or Cavities)। সেক্ষেত্রে এরকম কোনো সমস্যা হলে অবহেলা না করে দন্ত চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

দুধদাঁত পড়ে গিয়ে নতুন স্থায়ী দাঁত উঠার সময়ে নানারকম সমস্যা দেখা যায়। তার মধ্যে প্রধান সমস্যা হলো আঁকা-বাঁকা দাঁত বা উঁচু নীচু দাঁত। সেক্ষেত্রে Orthodontist বা Dental specialist-এর কাছে যাওয়া উচিত, তিনি সমস্যা দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন কীভাবে চিকিৎসা করা হবে। ▯

পশ্চিমবঙ্গ বোমা তৈরির কারখানায় পরিণত হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি ।। গত ২০ নভেম্বর বিভিন্ন পত্র পত্রিকার প্রথম পাতায় মালদার সুজাপুরে ভয়াবহ বিস্ফোরণের খবরটি প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্যের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর সেদিনেই মন্তব্য করেন, 'এবার বোমা তৈরির কারখানা বন্ধ করুন।' তৃণমূল সরকারকে রাজ্যপালের টুইটে মন্তব্যটি খুব তাৎপর্যপূর্ণ।

মালদার সুজাপুরে গত ১৯ নভেম্বর দুপুর ১১-৩৫ মিনিটে যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে গেল তাকে পুলিশ 'প্লাস্টিক মেসিন ফেটে দুর্ঘটনা' বলে চালানোর চেষ্টা করলেও স্থানীয় মানুষ তা মানতে রাজি নয়। তীব্র বিস্ফোরণে ছ'জন মানুষের মৃত্যু হয়। বেশ কয়েকজনকে জখম অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিস্ফোরণের তীব্রতা এতটাই যে দু' কিলোমিটার দূর থেকে মানুষ তার আওয়াজ শুনতে পেয়েছে। তাই কোনো মতেই মেসিন ফেটে বিস্ফোরণ হয়েছে বলে মেনে নিতে পারছেন না স্থানীয় মানুষ। যেভাবে বিস্ফোরণের স্থানে গভীর গর্ত হয়েছে, টিনের চালা উড়ে গাছের উঁচু ডালে আটকেছে এবং মৃতদেহগুলো ২০-২৫ হাত দূরে ছিন্নভিন্ন হয়ে ছিটকে পড়েছে তাতে শক্তিশালী বিস্ফোরক ছাড়া এইভাবে ঘটনাস্থল ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারতো না।

তাছাড়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে চারিদিকে অন্ধকার হয়ে যাওয়া এবং এক কিলোমিটার দূরের বাড়িঘর প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে ওঠা প্রমাণ করে যে এই বিস্ফোরণ কোনো সাধারণ বোমা থেকে হয়নি। স্থানীয় মানুষদের বর্ণনা অনুযায়ী ডিনামাইটের মতো কোনো শক্তিশালী বোমা প্লাস্টিকের বস্তা থেকে মেসিনে এসে পড়াতেই এই ভয়াবহ বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। রাজ্য সরকার স্বভাবতই এই বিস্ফোরণের ঘটনাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে যাতে রাজ্যপালের মন্তব্যকে নস্যাৎ করে কৌশলগত ভাবে রাজ্যের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল দেখানো যায়। তার জন্যই তড়িঘড়ি মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে কলকাতা থেকে ছুটে আসতে হয়েছিল সবকিছু ম্যানেজ করার জন্য। অথচ মালদার আপামর জনসাধারণ জানে কালিয়াচক ও সুজাপুরের বিভিন্ন স্থানে বেআইনি অস্ত্র কারখানার অস্তিত্ব ও বোমা বিস্ফোরণ কোনো নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও সীমান্তবর্তী এই এলাকায় অনুপ্রবেশ, গোরু পাচার, বোমা বিস্ফোরণ-সহ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের একাংশের লিপ্ত থাকার খবর পুলিশ প্রশাসনের কাছে রয়েছে।

এছাড়াও মৌলবাদী ও জেহাদিদের দ্বারা কালিয়াচক থানা জ্বালিয়ে দেওয়া এবং বন্দুক লুট করার ঘটনায় সারা দেশের কাছে পশ্চিমবঙ্গের এই এলাকা কুখ্যাত হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। আসলে এর আগে খাগড়াগড়-সহ রাজ্যের একাধিক বিস্ফোরণের ঘটনায় বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের খবর এনআইএ মাধ্যমে চলে আসায় একদিকে রাজ্য সরকার বেকায়দায় পড়েছে, অন্যদিকে রাজ্যপালের ট্যুইটে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও তোষণের রাজনীতি প্রকাশ্যে চলে এসেছে। আলকায়দার জঙ্গিও মালদা থেকে উঠে এসেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মুসলমান অধ্যুষিত এই সুজাপুরেই ২০-২৫টি প্লাস্টিক কারখানা থাকলেও তাদের সবার বৈধ কাগজপত্র নেই । তারা ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে সরকারি ছত্রছায়ায় রমরমিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এদিকে বিস্ফোরণের পরের দিন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞরা সুজাপুরে গিয়ে মেসিনটি পরীক্ষা করার সময় আবার মৃদু বিস্ফোরণ ঘটে। স্বভাবতই জেলা বিজেপি নেতৃত্ব ও দক্ষিণ মালদা লোকসভা কেন্দ্রের গত বছরের প্রার্থী শ্রীরূপা মিত্র চৌধুরী এই বিস্ফোরণের ঘটনার এনআইএ-কে দিয়ে তদন্তের দাবি করেছেন। উত্তর মালদার বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু ও কংগ্রেস বিধায়ক ঈশা খাঁর একই রকম দাবি থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে এইসব এলাকা এখন বারুদের স্তূপের মধ্যে রয়েছে এবং বোমা বানানো এই রাজ্যের শিল্পে পরিণত হয়েছে। একটি নির্বাচিত রাজ্য সরকারের প্রধান কর্তব্য রাজ্যের জনগণের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা, কিন্তু আজ অসহায় মানুষেরা বেঘোরে প্রাণ হারাচ্ছে। শাসকদল নিজেদের গাফিলতি এড়াতেই ব্যস্ত।

সাধারণ মানুষের একটাই প্রশ্ন, এরাজ্য কবে দুর্নীতিমুক্ত, বিস্ফোরণ ও তোষণমুক্ত হবে? □

মালদার সুজাপুরে কারখানায় বিস্ফোরণ।

শ্রীবালকৃষ্ণ নাইক এক নিষ্কাম দিব্যাত্মার জ্যোতিঃপুঞ্জে বিলয়

বিনোদ বনসল

উত্তর প্রদেশের কুশীনগরে গত ১৮ নভেম্বর রাত্রি এগারোটা ত্রিশ মিনিটে এক দিব্যজ্যোতি পরম জ্যোতিতে বিলীন হয়ে গেল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক বালকৃষ্ণ নাইক নিজের জীবনের সমস্ত ভৌতিক সুখ-সুবিধা ত্যাগ করে আজীবন নিঃস্বার্থ ভাবে দেশ-ধর্ম-সংস্কৃতি ও হিন্দু অস্মিতা রক্ষা ও সংবর্ধনকে নিজের জীবনের উদ্দেশ্য করে নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর পার্থিব শরীর এমন এক স্থানে ত্যাগ করলেন যেখানে ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ লাভ করেছেন। তিনি নিজেই এই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর পরিনির্বাণও ওই পুণ্যভূমিতেই যেন হয়। ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর উপদেশের প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিল। দেহত্যাগের পূর্বে তিনি কুশীনগরে ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ মন্দির দর্শন ও পূজা করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কাছে আশীর্বাদ নেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

গত ১০ নভেম্বর দিল্লিতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডলীর বৈঠকে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। শরীর খারাপ থাকা সত্ত্বেও তিনি পূজ্য সাধুসন্তদের দর্শন ও প্রণাম করতে এসেছিলেন। সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁর এমনই অগাধ শ্রদ্ধা ছিল। তিনি অত্যন্ত বিনম্র, শান্ত, সদাহাস্য ও মৃদুভাষী ছিলেন। তাঁর পুরো নাম বালকৃষ্ণ উত্তমরাও নাইক। মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদের সম্ভাজীনগরে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। গুজরাটের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে স্নাতক (গোল্ড মেডেলিস্ট) হয়ে আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে MSME ডিগ্রি লাভ করেন। তারপরে ১৯৬৩ থেকে ৬৫ দু'বছর ক্যালিফোর্নিয়ায় NARMCO R&D-তে রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার রূপে কাজ করেন।

১৯৬৬ সালে তিনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ভারতে ফিরে এসে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারকের ব্রত গ্রহণ করেন। এক বছর মহারাষ্ট্রের পরভণী জেলা প্রচারকের দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৬৭ সালে ঘোর কমিউনিস্ট দুর্গ পশ্চিমবঙ্গে তাঁকে পাঠানো হয়। সেখানে বর্ধমান জেলা প্রচারক, তারপর হাওড়া জেলা প্রচারকের দায়িত্ব পালন করার পর ১৯৭৪ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিভাগ সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ প্রান্ত সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। তাঁর সুযোগ্য কর্মদক্ষতায় পশ্চিমবঙ্গে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সংগঠন সুদৃঢ় হয়। ১৯৯০ সালে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পশ্চিম ক্ষেত্রের সংগঠন সম্পাদকের দায়িত্ব নিয়ে মুম্বই আসেন। ১৯৯৫ সালে কেন্দ্রীয় সংগঠন সম্পাদকের (বিশ্ব সমন্বয় বিভাগ) দায়িত্ব আসে। তারপর কেন্দ্রীয় যুগ্ম মহামন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব আসে।

বিশ্ব বিভাগের প্রমুখ রূপে তিনি আমেরিকা, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ইতালি, হল্যান্ড, নরওয়ে ইত্যাদি ইউরোপিয়ান, আমেরিকান ও ক্যারিবিয়ন দেশে ভ্রমণ করে ভারতীয় সংস্কৃতি ও হিন্দু জীবনমূল্যের প্রচার ও প্রসার করেন। ১৯৯৯ ও ২০০০ সালে ত্রিনিদাদে অনুষ্ঠিত ওয়ার্ল্ড হিন্দু কনফারেন্সে তিনি বিশ্ব বিভাগের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণ করেছিলেন। হিন্দু-বৌদ্ধ সংযুক্ত প্রতিনিধি রূপে তিনি শুধু থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, ভিয়েতনাম, মায়ানমার, নেপাল,ভুটান,শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়া, কোরিয়া, বাংলাদেশ, সুরিনাম, লাওস, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে ভ্রমণই করেননি, বরং হিন্দু-বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক ফাউন্ডেশনের প্রধান পূজ্য ভদন্তে জ্ঞানজগৎ মহাস্থবির মহারাজের সঙ্গে লুম্বিনীতে হিন্দু-বৌদ্ধ সম্মেলনেরও আয়োজন করেছিলেন।

প্রয়াণের আগেও তিনি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় প্রবন্ধ সমিতির সদস্য ছিলেন। ভারতভূমিতে সৃষ্ট সমস্ত মত, পন্থ

ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সমন্বয় সাধনের মতো কঠিন দয়িত্ব পালন করেছেন। তিনি গত ১৫ বছর ধরে এই সমন্বয় মঞ্চের প্রধান এবং পরে অভিভাবক রূপে কাজ করেছেন। দীর্ঘদিন হাঁপানি রোগে আক্রান্ত থেকেও তিনি সারা দেশে ভ্রমণ করেছেন।

দিল্লিতে আয়োজিত তাঁর স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি সভায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যাধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট অলোক কুমার বলেন, বালকৃষ্ণ নাইক শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতার 'যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্য কার্যমেব তৎ। যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্।।'—বাণীর মূর্ত রূপ ছিলেন। তিনি বিপশ্যনার দ্বারা মন ও বুদ্ধি বশে রাখার ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন। তিনি নিয়মিত ধ্যান করতেন। নিজের সমস্ত কর্ম তিনি যজ্ঞ, দান ও তপস্যা বলে মনে করে করতেন এবং তা করতেন নিজের অন্তঃকরণে সত্য ও সত্ত্বের বিকাশের জন্য। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, করোনার কারণে একটি সমিতির ভার্চুয়াল মিটিং করা হয়। পরে মিনটস বুকে লেখা হয়েছিল যে, অমুকের ঘরে মিটিং হয়েছে। কিন্তু মিটিং তো ফোনে হয়েছে, কারো ঘরে হয়নি। সুতরাং ঘরে কেন লেখা হবে? মিথ্যার সঙ্গে এতটুকু আপোশ করতে রাজি ছিলেন না তিনি।

নির্মল চরিত্র, বিনম্রতা, নিঃস্বার্থ ভলোবাসা ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার কারণে তিনি সমস্ত ক্ষেত্রে সফল হয়েছেন এবং সম্মান পেয়েছেন। সঙ্ঘের প্রচারক রূপে তেজস্বী জীবন অতিবাহিত করেছেন। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের পদাধিকারী রূপে ভারতবর্ষে উদ্ভূত সমস্ত ধর্ম ও মত-পথের মধ্যে সমন্বয় করেছেন এবং কাজ করতে করতেই নশ্বর শরীর ত্যাগ করেছেন।

অর্থাৎ পতত্বেষ কায়ো নমস্তে নমস্তে-র সার্থক উদাহরণ প্রস্তুত করছেন। এক নিষ্কাম জ্যোতি জ্যোতিঃপুঞ্জে বিলীন হলো। তাঁকে আমাদের বিনম্র প্রণাম।

(লেখক বিশ্ব হিন্দু পরিষদের রাষ্ট্রীয় প্রবক্তা)

এখন থেকে '**প্রণব**' পত্রিকা

অনলাইনেও পাওয়া যাবে—

www.bsspronabpub.com

প্রণব সংক্রান্ত যে কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য

ব্যবহার করুন—

swamivedanandamaharaj@gmail.com

maharajswaminirmalananda@gmail.com

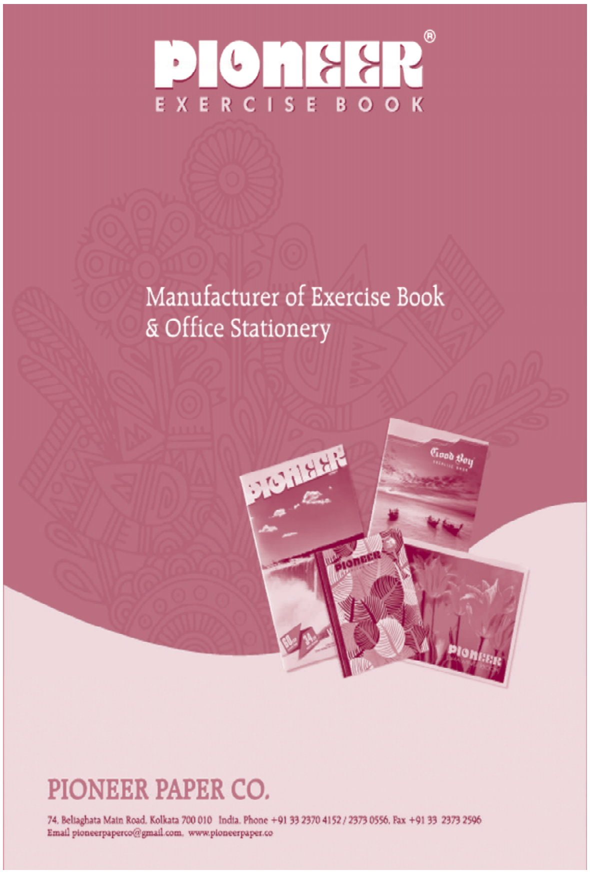

কমলপুর নগর পঞ্চায়েত

কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের 'সবার জন্য সবার উন্নয়ন'-এর নীতিকে ভিত্তি করে নানা উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে কমলপুর নগর পঞ্চায়েত।

১) শহর এলাকার সৌন্দর্যায়নের লক্ষ্যে স্পাইরাল লাইট লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি শহর এলাকার বিভিন্ন সরকারি দেওয়াল জুড়ে পরিবেশ সচেতনতামূলক, নেশা বিরোধী, প্লাস্টিক বিরোধী ও মনীষীদের জীবনী আধারিত নানা বিষয় চিত্রকল্প ও বাণীতে ফুটিয়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২) মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনার আওতায় ব্যাঙ্কগুলোর সঙ্গে সংযোগ রক্ষার মাধ্যমে এখনো পর্যন্ত ১২ জন স্ট্রিট ভেন্ডরকে বিনা সুদে ১০,০০০ টাকা করে ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

৩) এই প্রকল্পে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এখনো পর্যন্ত নগর এলাকা জুড়ে সাতটি বিশেষ শিবির করা হয়েছে ও ব্যবসায়ীদের বীমা প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ চলছে।

৪) মুখ্যমন্ত্রী করোনা প্রতিরোধ যোজনায় নগর এলাকা জুড়ে এক মাস ব্যাপী ৮টি শিবির করা হয়েছে।

৫) পরিচ্ছন্ন শহর গঠনের লক্ষ্যে বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের কাজ চলছে। পাশাপাশি সুসংহত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসাবে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কেন্দ্র ও বর্জ্য পৃথকীকরণ কেন্দ্র স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

অবিচ্ছেদ্য মানবতাবাদের আদর্শ অনুসারে সামগ্রিক বিকাশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে কমলপুর নগর পঞ্চায়েত।

CENTURYPLY®

CENTURYPLY® CENTURYLAMINATES® CENTURYVENEERS®

CENTURYPRELAM® CENTURYMDF® CENTURYDOORS™

zykron FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS

STARKE NEW AGE PANELS

SAINIK PLYWOOD HAMESHA TAIYYAR

For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555

E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

(৫১)

Dil main
INDIA
Let's illuminate the nation with Make in India
SURYA
MADE IN INDIA
LIGHTING | APPLIANCES
FANS | STEEL & PVC PIPES
AATMA NIRBHAR BHARAT KI PEHCHAN
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@surya.in | www.surya.co.in | suryalighting surya_roshni
Tel: +91-11-47108000, 25810093-96 | Toll Free No.: 1800 102 5657